আনন্দ-আশ্রম।

(উপন্যাস)

---

১৯ নং বৃন্দাবন বসাকের লেন, সুলভ পুস্তকালয়,
শ্রীননীগোপাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

PRINTED BY P. S. SAHA,
AT THE
NEW CALCUTTA PRESS,
2, Hari Mohun Basu's Lane, Calcutta.

1893.

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যার ছায়া আসিয়া পড়িল। শীতকালের ঘড়ীতে ৫টা বাজিয়া গেল। সূর্য্যদেব বিশ্রাম লইতে সন্ধ্যার ছায়ার মধ্যে আশ্রয় লইলেন।

প্রকৃতির এই গম্ভীরতার সময়ে পাঠক, একবার কলিকাতা নিমতলার ঘাটের দৃশ্য কল্পনার চক্ষে ভাবিয়া দেখুন।

দেখে, সংসারের অনেকে অনেক জিনিষ; কিন্তু তাহার ভাব গ্রহণ করে কয় জন? লেখা পড়া ত অনেক লোকেই করিয়া থাকে; কিন্তু বিদ্বান্ হয় তাহাদের মধ্যে কয়টি?

তাই বলি পাঠক, যদি ভাবের ভাবুক হও, তবে এই সন্ধ্যাকালীন শ্মশান ঘাটের কথা ভাবিয়া দেখ। লিখিয়া সে ভাব বুঝাইতে চেষ্টা করা, লেখক পাঠক উভয়েরই

বিড়ম্বনা; আর ভাববিহীন লোককে কেই বা লিখিয়া পড়িয়া এ জগতে কি বুঝাইতে পারে।

সকলই জানিবে নিজ হৃদয়ে। এই হৃদয়ের যে অধিকারী, তাহার এ সংসারে কিসের অভাব? আর যাহার এই হৃদয়ের অভাব, তাহার পক্ষে সমগ্র জগৎকে সূর্য্যহীন ভীষণ আঁধারময় নরক বলিলেও হয়। হৃদয়হীন লেডী ম্যাক্‌বেথের পক্ষে এ সংসার কি সত্যই এক ভীষণ নরককুণ্ড নহে? আর হৃদয়বতী সীতা—রামের স্ত্রীর নিকট এই কণ্টকময় প্রেমহীন শুষ্ক অতি নীরস সংসার—অবশেষে সুকোমল কুসুম-শয্যায় পরিণত হইল।

তাই বলিতেছিলাম, হৃদয়বান পাঠক চলুন, এ সময়ে আপনাকে একবার নিমতলা ঘাট দেখাইয়া আনি। যদি বলেন, সংসারে এত ভাল মন্দ জিনিষ থাকিতে এই সন্ধ্যাকালে সে বেয়াড়া বদ্‌খত স্থানে যাইব কি নিমিত্ত? উত্তরে অকিঞ্চন লেখক বলেন, অমবশ্যার অভাবে পূর্ণিমার শোভা কোথা?

দাহ স্থানের বহির্ভাগে একখানি খাটিয়াতে এক বৃদ্ধ অর্দ্ধ-শায়িত। খাটিয়ার চারি পাশে ৫।৬ জন স্ত্রী ও পুরুষ দণ্ডায়মান। সকলেরই মুখে বাহ্যিক বিষাদের চিহ্ন। বাহ্যিক বলিবার কারণ এই যে, বৃদ্ধের মৃত্যুতে আন্তরিক দুঃখিত হয়, এ সংসারে অল্প লোক।

বৃদ্ধের বয়স ৬০ বৎসরের অধিক হইবে না। শরীর দেখিলে, তাঁহার এ অসময়ে এ শয়নটা অতি অন্যায় কার্য্য বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু অন্যায় হইলে কি হইবে? চিকিৎসকের অনুমতি, উত্তরাধিকারীদের ইচ্ছা কুটুম্বগণের উৎসাহ; কাজেই, তাঁহাকে এ স্থানে এ সময়ে শয়ন করিতেই হইবে। এখন ভাগীরথীর অনুগ্রহ।

বৃদ্ধ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় ঝিমাইতেছেন ; চক্ষু দিয়া দর দরিত ধারা বহিয়া বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতেছে। পার্শ্বস্থ একজন বলিয়া উঠিল,—"এই যে, জামাই বাবু এসেছেন!" সকলে ফিরিয়া দেখিল, সত্যই জামাই বাবু উপস্থিত। জামাই বাবু চক্ষে রুমাল দিয়া বৃদ্ধের সম্মুখে আসিলেন। বৃদ্ধ ফুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন,—"বাপু রে! আমি কোথা যাচ্চি রে!"

স্ত্রীলোকেরা এই ক্রন্দনের সহিত যোগ দিলেন। পুরুষের মধ্যে কেহ "দুর্গা" বলিয়া হাঁফ ছাড়িলেন। কেহ একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বুকের বোঝা নামাইলেন। বক্রী দুই জন যুবা চক্ষে রুমাল দিলেন। যুবকদ্বয় সম্ভবতঃ বৃদ্ধের পুত্র বা অন্য কোন নিকট আত্মীয় উত্তরাধিকারী।

এখানে একটি কথা চট্ করিয়া বলিতে চাই। পাঠক, আপনি কি সোসিওলিষ্ট? যদি সে দলভুক্ত না হন, তবে বলুন দেখি, এইরূপ দুই একবার রুমাল চক্ষে দিয়া একটা লোকের যাবজ্জীবনের উপার্জ্জিত অর্থের উত্তরাধিকারী হওয়া কি বড় সুখের কথা নহে? যাহারা শ্রম অনুসারে সম্পত্তির ভাগ বাঁটোয়ারী করিতে চাহে, তাহারা কি সংসারের কণ্টক নহে?

ক্রমে দুই চারি জন দর্শকও বৃদ্ধের পার্শ্বে জমিয়া মজা দেখিতে লাগিল। এরূপ অবস্থার মজা, জগতের মধ্যে কেবল এক মানুষেই দেখে, অন্য কোন জন্তুতে দেখে না।

যখন "হায়, আমি কোথা যাচ্চি!" বলিয়া বৃদ্ধ ডুকরাইয়া উঠিল। তখন দর্শকগণের মধ্যে একটি সুন্দর যুবক মূর্ত্তি ঈষৎ হাস্য করিয়া পার্শ্বস্থ অপর যুবকের প্রতি মৃদুস্বরে কহিলেন,—"মৃত্যু কি মজার জিনিষ! এস সুরেন্দ্র, যাওয়া যাক।"

এই বলিয়া যুবক ভিড় হইতে বাহির হইয়া চলিতে লাগিলেন; অপর যুবকটিও তাঁহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিলেন। যাইতে যাইতে প্রথম যুবক কহিলেন,—"মজা দেখিলে? মরণটা কি আশ্চর্য্য কাণ্ড! দেখ দেখি ভেবে, লোকটা অশীতি-পর বৃদ্ধ, জীবনের সর্ব্ব প্রকার ভোগসুখে বঞ্চিত, তবুও মরিতে কিছুতেই রাজী নয়।" দ্বিতীয় যুবক এ কথার কোন উত্তর করিলেন না; কেবল গম্ভীর ভাবে একটু সুগভীর হাস্য হাসিলেন। সে হাসিটুকু যেন জাতের সমুদয় দর্শন বিজ্ঞান চোঁয়াইয়া প্রস্তুত।

যুবকদ্বয় বেগে চলিয়া গেলেন। সমুদয় জগৎ আঁধারে ডুবিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সহরের বাহিরে একটি ছোট দক্ষিণদ্বারী বাগানবাড়ী। সম্মুখে প্রশস্ত ময়দান। তাহার মধ্যে লোহার শৃঙ্খলে ঘেরা ছোট একটি গোলাপকুঞ্জ। ১৫।১৬ হাত পশ্চিমে গঙ্গা প্রবাহিত। বাড়ীটির দক্ষিণ গাএ একটি সুদীর্ঘ বৈঠকখানা। ঘরটির মেজে সুন্দর ম্যাটিংএ অচ্ছাদিত। এই ম্যাটিং আচ্ছাদিত মেজের উপরিভাগে স্থানে স্থানে কৌচ কেদারা টেবেল ইজিচেয়ার ইত্যাদিতে সুসজ্জিত। এক কথায় ঘরটি উচ্চ অঙ্গের আংলো ইণ্ডিয়ানের ড্রয়িং রুম বিশেষ। এখন বুঝিয়া দেখুন, ব্যাপারটা কি?

মধ্যস্থলে গোলাকার টেবিলের উপরিভাগে এক নানা তর বেতর ছক্কাটা সুন্দর হিংক্স ল্যাম্প দল্ দলায়মান। তাহার উত্তর প্রান্তে ভেল্ভেটের গদিমণ্ডিত এক খানি চেয়ার। এই চেয়ারের উপরি ভাগে অই সুন্দর মুর্ত্তিটি কি! তাহা কি বর্ণনা করিয়া পাঠককে বুঝাইতে পারিব? দেখা যাউক, পাঠকের অদৃষ্টবল আর লেখকের হাতযশ।

বর্ণনা কিন্তু পদতল হইতেই সুরু করিব। কালিদাসের প্রতি বীণাপাণির অভিশাপের কথা কোন মূঢ় ভুলিবে। আমা-

দের বর্ণনার পাত্রী স্বয়ং পূর্ণা বীণাপাণি হউন বা নাই হউন; সরস্বতীর অংশারূপে যে ভারত উদ্ধারে অবতীর্ণা তাহাতে আর কোন কথাই নাই।

সরস্বতীর পদযুগল সম্মুখস্থ টেবিলের উপরি সংস্থাপিত, গোলাপী রংএর মোজায় আবৃত, সর্ব্ব প্রকার বর্ব্বর-ব্যবহৃত অলঙ্কারাদি বর্জ্জিত ; এক কথায় এই পদযুগলের বর্ণনা করিতে হইলে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যেন বিধাতা এক যোড়া রামরম্ভাতরু উল্টা করিয়া ভূগর্ভে পুঁতিয়া রাখিয়াছেন। নিতম্ব নিবিড়-চেয়ার খানি যোড়া। তদুপরি কটিদেশ ক্ষীণ—এতই ক্ষীণ যে, একটি লোক মুটা বাঁধিয়া ধরিলে, বোধ হয় মুটা ফাঁক থাকিয়া যায়। তদূর্দ্ধে হৃদয়দেশ বিশাল—বিস্তৃত—শ্যামল ক্ষেত্র বিশিষ্ট—হিমালয়ের পাদদেশ বিশেষ। হৃদয়োপরি কুচযুগ স্তূপাকারে কাপড় চোপড়ে পরিশোভিত হইয়া উন্নতশীর্ষ কাঞ্চনজঙ্ঘার ন্যায় উনবিংশ শতাব্দীর সুরুচি বা Eastheticcultureএর পরিচয় প্রদান করিতেছে। হৃদয়ের দুই পার্শ্ব হইতে মৃণাল ভুজদ্বয় সটান সরলাকারে বাহির হইয়া অবশেষে দশটি চম্পক কলিকায় পরিণত হইয়াছে। হৃদয়ের মধ্যস্থল হইতে গ্রীবার উত্থান ; গ্রীবার উপরিভাগে বদনমণ্ডল বা শারদীয় পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর অথবা নির্ম্মল সরোবর মধ্যস্থ কমনীয় মৃণাল-দণ্ডোপরি শতদল পদ্মিনী বিকশিত। পোড়া হাঁসের পালক কিসে শোভার এক অংশ বর্ণনে সমর্থ ? হৃদয় ফাটিয়া যায়! হায় রে ভারতচন্দ্র! তুমি এখন কোথা ? এ সৌন্দর্য্যের ফটো তুলিতে সমর্থ, এমন ফটোগ্রাফার কি আর পোড়া বঙ্গে আছে।

সুন্দরী নির্জ্জন বৈঠকখানায় নিজের ভাবে নিজে ফুটিয়া,

জলদগম্ভীরভাবে ভেল্‌ভেট মণ্ডিত চেয়ারোপরি নীরবে বসিয়া আছেন। দেখিলে বোধ হয়, মোম নির্ম্মিত একটি ষ্টাচিউ বৈঠক খানা উজ্জ্বল করিতেছে। সুন্দরীর হস্তে এক খানি ইংরাজী সংবাদ পত্র; সম্ভবতঃ লণ্ডন টাইমস্‌। যুবতী কখন উহা পড়িতেছেন, কখন তদ্দ্বারা ব্যজন করিতেছেন। এ হেন কালে নিমতলা ঘাটের সেই সুযোগ্য সুন্দর যুবক বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। একটু দাঁড়াইয়া শান্ত ভাবে চতুর্দ্দিকে ঈষৎ দৃষ্টিপাত করিয়া পার্শ্বস্থ একখানি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।

সুরেন্দ্র বাবুর মূর্ত্তি গম্ভীর, দৃষ্টি স্থির, কিন্তু আগন্তুক চক্ষে এ স্থিরতা বা গাম্ভীর্য্য স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না; অথচ, চঞ্চল প্রকৃতি লোক, উচ্চ পদস্থ ব্যক্তির নিকট যেরূপ কৃত্রিম বাহিক প্রশান্ত ভাব ধারণ করে, এ স্থৈর্য্য বা গাম্ভীর্য্য সে জাতীয়ও নহে। বিশেষ ক্রন্দন ক্রোধ বা কলহের পর হৃদয় যে গম্ভীর ভাব ধারণ করে, এ সেই ভাবের গাম্ভীর্য্য।

ক্ষণ পরে যুবতী প্রেমগদগদভাবে অল্প হাসিয়া কহিলেন,—"Dear সুরেন্দ্র, here is good news for you." সুরেন্দ্র গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—"ব্যাপার কি?" সুরেন্দ্রের অন্যায় গাম্ভীর্য্যে যুবতী একটু বিরক্ত ও বিমর্ষ হইলেন। ইচ্ছা যে, আর কোন কথা না বলেন; কিন্তু সেটাও নেহাত কেমন কেমন দেখায় বুঝিয়া, ছলনাময় গম্ভীর স্বরে গদগদ বচনে কহিলেন,—"আমেরিকার মহিলাগণ ত দিন দিন বিলক্ষণ উন্নতিশীলা হইয়া উঠিতেছেন।"

সুরেন্দ্র। (গম্ভীরভাবে) সেটা আর নূতন কথা কি?

যুবতী। একটু বিশেষ নূতন ঘটনা ঘটেছে।

সুরেন্দ্র এ কথায় গাম্ভীর্য্যের খোলস ছাড়িয়া আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন? কি নূতন ঘটেছে?"

যুবতী কহিলেন,—"আমেরিকার দুই জন লেডী, পুরুষেরা এত দিন যে স্ত্রীস্বাধীনতা কেন দেন নি, তদ্দরুণ সমাজ হ'তে ক্ষতিপূরণের দাবী করেছেন।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে জুতার শব্দ শুনা গেল।

সুরেন্দ্র কহিলেন,—"নিরুপমা, এখন একটু ভিতরে যাও। মোহিনী বাবু আস্‌ছেন।"

নিরুপমা চলিয়া গেলেন। বাহির হইতে কে এক জন কহিল,—"সুরেন্দ্র, সত্যই কি অনাথিনী বালিকাকে পরিত্যাগ করিলে?" সুরেন্দ্রের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল। সুরেন্দ্র ভয়ে কাঁপিতে লাগিলেন। আবার বাহির হইতে জিজ্ঞাসা করা হইল,—"সুরেন্দ্র, স্পষ্ট কথায় শেষ উত্তর দাও। উত্তর না লইয়া আমি এ স্থান হইতে এক পদও নড়িব না। বালিকার বিষয় কি স্থির করিয়াছ?"

সুরেন্দ্রের মস্তক ঘূর্ণিত হইল; বক্ষের মধ্যে শত শত কামানের ধ্বনি হইতে লাগিল। অজ্ঞানভাবে কহিলেন,—"আপনার কন্যার জন্য ঈশ্বর অন্য রক্ষক নির্দ্ধারিত করিয়াছেন।"

এই বলিয়া সুরেন্দ্র উন্মত্তের ন্যায় গৃহের বাহির হইলেন। বাহিরের লোকটি দ্বিতীয় কথা না কহিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।
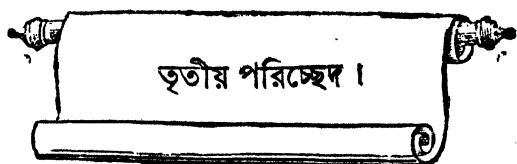
রাত্রি ৯॥০ টার তোপ পড়িল। গঙ্গাতীরে বাঁধা ঘাটে সুরেন্দ্র ও রামতারণ বাবু আসিয়া বসিলেন।

রামতারণ বাবু কহিলেন,—"ও সব কথা বেশী ভাবা ভাল নয়। ওতে ধাঁ করে মন বিগ্‌ড়ে যেতে পারে।"

সুরেন্দ্র। অসার সংসারে আর কি ভাবিব ?

রাম। তুমি যে দেখ্‌ছি দ্বিতীয় বুদ্ধ হয়ে দাঁড়ালে। গঙ্গার ঘাটে এক হাজার মড়া পোড়াতে এ বয়সে দেখ্‌লেম। কৈ, মন ত কখন বেগ্‌ড়ালো না।

সুরেন্দ্র। যুধিষ্ঠিরও তাই বলেছেন,—"কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং"

রাম। তা বলুন, তোমার যুধিষ্ঠিরই বলুন, আর ধৃষ্টদ্যুম্নই বলুন; সকল কথা ধর্ত্তে গেলে, কি আর সংসার চলে ব্রাদার!

সুরেন্দ্র। এখন তবে কি ধরি, তা বলে দিন।

রাম। ধর্ম্মে আর কি, খাও দাও বেড়াও—সংসারের কাজ কর, Humanityর progress যাতে হয়, তাই কর, যা positive। মিছে আকাশে খুঁটি গেড়ে ফল কি ? কেন, কম্‌ট কি পড় নি ?

সুরেন্দ্র। কম্‌ট পড়েছি, কম্‌টের গোঁড়ামীও করেছি যথেষ্ট। এখন দেখছি কম্‌টের মত অতি ভয়ঙ্কর জিনিষ;

উন্মত্তের পক্ষে সুরাবৎ। সংসার-মদে মত্ত পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রাপ্তকে সে ভয়ঙ্কর মদিরা অধিকতর প্রমত্ত করিয়া তুলে।

রাম। এখন সুখে থাকা ত চাই। চার্ব্বাক বলেন,—"যাবৎ জীবেৎ সুখং জীবেৎ ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।" এও ত আমাদেরই দেশের কথা। আর আমাদের দেশই বা বলি কেন? সভ্যতা, উন্নতি, বিদ্যা, বাণিজ্যের লীলাভূমি ইউরোপে যাও, সেখানকার শিক্ষাগুরু মিল, বেন্থাম প্রমুখ দার্শনিকগণ সুখকেই মানবের আদর্শ ধরে গেছেন; যত কিছু উন্নতি, সব তাই নিয়ে।

সুরেন্দ্র। আপনিও এরূপ কথাটা ব'লে ফেল্লেন! আপনি এক জন বহুদর্শী পণ্ডিত ব্যক্তি। Utilitarianism যে অতি জঘন্য পশু প্রকৃতির পরিপোষক; পশুভাবাপন্ন ইউরোপীয় সমাজেই তা শোভা পায়।

রাম। পোষকতা কেন করি, তবে শোন,—দেখেছি শুনেছি বিস্তর ভাই। সব দেখে শুনে এখন ইস্তফা দিয়ে বসে আছি যে, দুনিয়ায় কিছুই ঠিক্ হবার যো নেই।

সুরেন্দ্র। সেও ত বড় ভয়ঙ্কর মীমাংসা। সে মীমাংসায় কি আপনি শান্তি লাভ কর্ত্তে পেরেছেন?

রাম। বলে 'ধরে বেঁধে প্রেম আর ঘসে মেজে রূপ।' তাই আর কি। এখন তায় শান্তি লাভ না করে আর কি করি, তা বল। সংসারও অসার, শান্তি লাভেরও কিছুই ঠিক্ হবার যো নাই। এমন অবস্থায় শান্ত না হয়ে কি করি তা বল ত ভাই?

সুরেন্দ্র। তবে নেহাত নাচারে পড়ে আপনি শান্ত হয়েছেন বলুন।

রাম। তা বৈ আর কি; নইলে, আর মিছে গোলক-

ধাঁধায় কত কাল ঘুর্ব্বো? তবে শান্ত হই নি, ভেকো হয়েছি বল্‌তে পার।

এই কথার পরেই নিকটবর্ত্তী গির্জ্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া ১০টা বাজিয়া গেল। রামতারণ বাবু বলিলেন—"ওহে বড় ভুল হয়ে গেছে। নবীন মাধব বাবুর সঙ্গে আজ থিয়েটার দেখ্‌তে যাবার কথা ছিল।

সুরেন্দ্র। তাই ত। কাজ ত তবে বড় অন্যায় হয়েছে। সে ভদ্রলোককে অনর্থক ঘুরিয়েছেন।

রাম। না তিনি ঘুর্‌বার লোক নন। বড় থিয়েটার-পাগ্‌লা লোক; কিন্তু ও ধারে পরম পণ্ডিত, বিলক্ষণ জ্ঞানী। লেখা শুনা যে কতই ভদ্রলোকের আছে, তার আর ঠিকানা নাই।

সুরেন্দ্র। কি করেন?

রাম। আগে প্রফেসার ছিলেন। এখন Retire হয়েছেন, কর্ম্মাঠাঁরে থাকেন।

সুরেন্দ্র। আহা! কর্ম্মাঠাঁর জায়গাটি বড়ই সুখের! বড় নির্জ্জন। তথায় প্রাকৃতিক দৃশ্যও অতি মনোহর।

রাম। তুমি কিসে জান নে?

সুরেন্দ্র। আমি যে সেখানে প্রায় ছ মাস ছিলুম। আবার মনে কর্চ্চি—

এমন সময়ে নিমতলা ঘাটের সেই যুবক আসিয়া একটু রুক্ষ-স্বরে কহিলেন,—"বেশ! বেড়ে মজার আদ্‌মী ত তোমরা!"

সুরেন্দ্র। গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"অপরাধ!" যুবক ঘন ঘন করিয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"কি বেহায়া! আবার মুখ ফুটে বলছে "অপরাধ!" এই কথার পর যুবক

সুরেন্দ্র উত্তর অপেক্ষা না করিয়া কহিলেন,—"রামতারণ বাবুকে আর দেখ্‌বার যো নাই। এখন কোথায় থাকেন মশাই?" রামতারণ বাবু উত্তর দিতে যাইতেছেন, যুবক অমনি সুরেন্দ্রের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"গত সপ্তাহের অমৃতবাজার কোথা হে? তাতে একটা বড় মজার লেখা বেরিয়েছে শুন্‌লুম। তোমরা কেউ দেখেছ কি?"

সুরেন্দ্র স্থিরভাবে কহিলেন "না"।

যুবক আবার আরম্ভ করিলেন,—"কাল থেকে পেটের যে গোলযোগ যাচ্ছে। মাল্‌দা থেকে বাড়ীতে ২৫টা ফজলি আম এসেছিল, তার দুটা খেয়ে আজ সকাল থেকে পেটের বড় গোলযোগ!"

সুরেন্দ্র হাসিয়া কহিলেন,—"এই যে বল্লে কাল থেকে? শিবদাস এই বার খেলাপে পড়েছে।"

শিবদাস একটু তেরিয়া মেজাজে কহিলেন,—"ওটা slip of the tongue তোমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই—কেবলই মজা মারা। বাপা ঠাকুরদাদা কিছু জমিয়ে রেখে গেছ্‌লো তাই রক্ষে, নইলে তোমার উপায় যে কি হতো।" এটি বড় অভিমানের কথা।

শিবদাসের অভিমান মিশ্রিত রাগ দেখিয়া সুরেন্দ্র ও রাম-তারণ বাবু হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

শিবদাস নীরবে হস্তস্থিত গজদন্ত নির্ম্মিত হেণ্ডেল বিশিষ্ট ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে দক্ষিণ দিকে চলিতে লাগিলেন। দুই চারি পদ যাইয়া গান ধরিলেন,—"বাতা যে প্যারে কোন্ গরিবে গেঁই মেরি জান।" গম্ভীর স্বরে এই চরণটা ক্রমা-

গত আবৃত্তি পুনরাবৃত্তি করিতে লাগিলেন; ও ধারে যাইবার ক্ষমতা আর হইল না; বোধ হয়, এইটুকু বই তাঁহার পুঁজি ছিল না।

শিবদাস যে গোসা করিয়া চলিয়া যাইতেছেন, তাহা সুরেন্দ্র ও রামতারণ বাবুর বুঝিতে বাকী রহিল না; তথাপি, তাঁহারা শিবদাসের মনস্তুষ্টির চেষ্টা বড় পাইলেন না; শিবদাসও ফিরিলেন না; গোসা করিয়া চলিয়া গেলেন। এমনি দুই একটি মিত্র এ সংসারে মিলিয়া যায়, যাহাদিগকে আমরা অন্তরে ভালবাসি; কিন্তু নিকটে আসিলে অনেক সময় আমরা বড় বিরক্ত হই।

পাঠক, এ পর্য্যন্ত যে কয়টি লোক দেখিলেন তাঁহাদের মধ্যে কোন্‌টি কি ধরণের লোক, তাহা বুঝিয়া লইয়াছেন কি? যদি না বুঝিয়া থাকেন, তবে অগত্যা বলিব যে, আমার ভাগ্যক্রমে আপনি তেমন সমঝ্‌দার পাঠক নহেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।
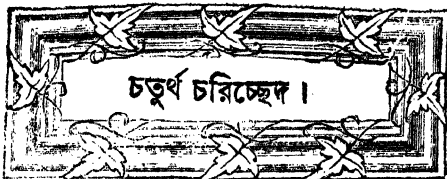
প্রথমে নিমতলার ঘাটে যতগুলি লোক দেখি, তাহাদের মধ্যে অনেকগুলি বাজে লোক; কাজের লোক যে দুই জন, তাঁহারা ভিড়ের বাহিরে চলিয়া আসিলেন। তাঁহাদেরই মধ্যে একজন এই সুরেন্দ্র, অন্য লোকটি যে অর্দ্ধ আহাম্মুখ ধর্ম্মদাস, সে কথা বুঝিতে বোধ হয় পাঠকের বাকী নাই।

সুরেন্দ্র বাবু একজন পাড়াগেঁয়ে ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ তালুকদারের ছেলে। বিবাহ তাঁহার অল্প বয়সেই হইয়াছিল। বিবাহের পর লেখা পড়া শিখিবার জন্য পিতা তাঁহাকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দেন। যখন তিনি প্রেসিডেন্সিতে সেকেণ্ড-ইয়ার ক্ল্যাসে পড়িতে আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার মন বিগড়াইয়া পড়া শুনায় বিরক্তি জন্মে। এমন সময়ে পিতার মৃত্যু হইল, সোণায় সোহাগা পড়িল। সুরেন্দ্রমোহন কলেজ পরিত্যাগ করিলেন।

ভাগ্যক্রমে সুরেন্দ্রনাথকে কলেজ পরিত্যাগ করিয়া অর্থের জন্য চাকুরীর উমেদারী করিবার বিশেষ আবশ্যক হয় নাই। পিতার মৃত্যু হইলে, তিনি প্রায় পাঁচ হাজার টাকা সালিয়ানা আয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন। চিন্তার বিষয় বড়

কিছুই সুরেন্দ্রের পক্ষে রহিল না; তবে একটু চিন্তার কথা এই যে, পিতা মরিবার সময় হাজার ত্রিশ টাকা ঋণ রাখিয়া যান।

এই ভাবনার হস্ত এড়াইবার নিমিত্ত সত্বর বিষয়ের বন্দোবস্তে স্বয়ং হস্তক্ষেপ করিলেন। সুরেন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোকপ্রাপ্ত যুবক; সুতরাং, সুরেন্দ্রের আবার ঋণের ভাবনা কতক্ষণ? সুরেন্দ্র সত্বর পিতৃপুরুষগণের নির্দ্ধারিত হিন্দু-আশ্রম-অনুযায়ী ব্যয় সংক্ষিপ্ত করিয়া দিলেন। সুরেন্দ্রের পিতা বড় গোঁড়া হিন্দু ছিলেন; ক্রিয়া কর্ম্মের সময় কর্জ্জ করিয়াও অধিক ব্যয় ভূষণ করিয়া ফেলিতেন; তখন তাঁহার ভবিষ্যতের ভাবনা বড় একটা থাকিত না; এই জন্যই মনস্তাপের বিষয় যাহা একটু পশ্চাতে সুরেন্দ্রের ভোগের নিমিত্ত তাঁহার পিতা রাখিয়া গিয়াছিলেন; নতুবা, অন্য কোন বিষয়ে সুরেন্দ্রকে বিশেষ ভাবনা ভোগ করিবার বড় কিছুই ছিল না।

সুরেন্দ্র নিজে একজন বেশ সুন্দর লেফাফা-দুরস্ত সুন্দর পুরুষ। স্থলবিশেষে অনেক সুন্দরীকে তৎপ্রতি আগ্রহের সহিত দৃষ্টিপাত করিতে দেখা গিয়াছে। তাঁহার শরীরে শক্তি সামর্থ্যও যথেষ্ট আছে। চক্ষে সময়ে সময়ে চশ্‌মা ধারণ ব্যতীত অন্য অসুখেরও বিশেষ কোন কারণ বড় দেখা যায় না। আহারে ব্রহ্মার বরপুত্র বিশেষ; একটি নাবালক ছাগবৎস দুই বেলায় প্রত্যহ উদরস্থ করেন; তাহার উপর অন্য দ্রব্যাদিও বাদ যায় না। বিষয় সম্পত্তির কথা ত পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

দাস, দাসী, খানসামা, আদি সংখ্যায় ১০।১৫ টি, সর্ব্বক্ষণ

তটস্থ; ইহার উপর অনুস্বার বিসর্গ আদি অনুচরবর্গও আছে; হাঁ করিলে, বিশজন উপস্থিত; তদুপরি এক বিবিয়ানা সুন্দরীর প্রণয় পত্র। বাঙ্গালী যুবকের পক্ষে জীবনের আর কিসের অভাব ?

পিতার মৃত্যুর পর, সুরেন্দ্র শিক্ষিতা (বা অশিক্ষিতা যাহাই বলুন) নিরুপমার পাণিগ্রহণ করেন। সুরেন্দ্র দুই চারি দিনের উপাসনা আরাধনায় ইহাঁর করপদ্মলাভে ভাগ্যবান্ হইয়াছিলেন। অশিক্ষিত অষ্টাদশ শতাব্দীর কুপ্রথামত পাত্রীর কুলশীল পরীক্ষার নিমিত্ত মিছামিছি যন্ত্রণাভোগ করেন নাই। আমরা আর সে কথার আন্দোলন আলোচনা করিয়া পাঠক মহাশয়কে বিব্রত নাই বা করিলাম; সে কথা এই খানেই চাপা রহিল; পাঠক সমঝ্‌দার হয়েন, ছাই উড়াইয়া আগুন নিজেই বাহির করিয়া লইবেন।

বিষয় সম্পত্তির বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত সুরেন্দ্র নিরুমাকে সঙ্গে লইয়া একবার স্বদেশে—পল্লীগ্রামে গমন করেন। তথায় তাঁহারা বিশেষ তেমন আত্মীয়বর্গ কেহই ছিল না; কেবল কতিপয় প্রাচীন জ্ঞাতিবর্গের মধ্যে দুই একটি এখানে ওখানে পড়িয়া ধুক্‌ধুক্ করিতেছিল। নিজ বাড়ীতে খুড়ী, মাসী, পিশী, বিধবা খুড়তুতা ভগিনী, বাপের শ্যালক প্রভৃতি কতকগুলি কুপোষ্য সুরেন্দ্রের পিতার আমল হইতে প্রতিপালিত হইতেছিল। সুরেন্দ্রের বয়স যখন ১১ বৎসর, তখন তাঁহার জননীর মৃত্যু হয়।

সুরেন্দ্র ও নিরুপমা গ্রামে আসিলে, পল্লীগ্রামের লোক ভিড় করিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতে আসিল। কিন্তু সুরেন্দ্রের

হ্যাট কোট ও সাহেবী ভাবভঙ্গী এবং নিরুপমার বিবিয়ানা চাল চলন; তদুপরি লাল পোষাক পরা চাপরাশওলা খানসামা-গণের ভ্রূভঙ্গীতে কেহ তাঁহাদের নিকটে ঘেঁসিতে বড় সাহস করিল না; তফাৎ হইতে কোন রকমে কায়ক্লেশে দেখিয়া শুনিয়া চলিয়া গেল। নিরুপমা তাহাতে বড় বিরক্ত হইয়া গৃহের দ্বার ও জানালা রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

গ্রামে বিষম গোলমাল উঠিল। গ্রামে যে অল্পসংখ্যক ভদ্রলোক বাস করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে সকলেই গুরুমহাশয়ের পাঠশালার বা অধ্যাপকের টোলের ছাত্র; সুতরাং, তাহারা সকলেই সুশিক্ষিত, অশিক্ষিত, অর্দ্ধ শিক্ষিত, পোয়া শিক্ষিত বা শিকি শিক্ষিত ইত্যাদি ইত্যাদি। তাঁহাদের মধ্যে কাহারও ইংরাজী বর্ণবোধ পর্য্যন্ত নাই। ইহাঁরা সকলে একযোট হইয়া ঘোঁট আরম্ভ করিয়া দিলেন। জলে স্থলে শূন্যে সর্ব্বত্রই সুরেন্দ্র ও নিরুপমার সমালোচনা।

পাঠক, যদি পাড়াগেঁয়ে হও, তবে অবশ্যই অবগত আছ যে, প্রায় প্রতি পল্লীগ্রামে একটি করিয়া আড্ডাঘর আছে। গ্রামের নিষ্কর্ম্মা লোকেরা দিনের মধ্যে ২০।২২ ঘণ্টা সেইখানে রাজা উজির মারিয়া কাটাইয়া দেয়। সুরেন্দ্রের গ্রামস্থ সেই আড্ডায় অদ্য কেবল সুরেন্দ্রের কাহিনী চলিতেছিল, একজন কহিলেন,—"ওহে, মজার কথা শুনেছ? সুরেন্দ্র নাকি মেম বিয়ে করে এনেছে!" আর একজন উত্তরে বলিলেন,—"বিলক্ষণ! ওটা ইহুদীবাই। কলু-টোলায় শীলেদের বাড়ী আমিপুজোর সময় ওকে নাচতে দেখেছি। তৃতীয় সমালোচক কানা বলিলেন বিলক্ষণ! তোমরা ত সবই জান! পীঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর! কোন ঠাঁই ত আর কেহ

পদার্পণ কর্‌লে না কখন, তা জান্‌বে কি? ওটা কসাইটোলার ছায়্‌দু সেখের শালী।”

ঘাটে মাঠে মেয়ে পুরুষে এমন করিয়া কাণাকাণি হাসা-হাসি করিতে লাগিল; কিন্তু তাহাদের সমালোচনা সমূহের স্থান হওয়া এ ক্ষুদ্র পুস্তকে অসম্ভব।

সুরেন্দ্র ও নিরুপমা স্বচ্ছন্দে নিরুদ্বেগ চিত্তে দ্বিতল গৃহে নির্জ্জনে বসিয়া বসিয়া পার্লিমেণ্টের বক্তৃতা সমালোচনা করিতেছেন কখন মিল্‌টনের প্যারাডাইস লষ্টের শ্রাদ্ধ করিতেছেন, কখন বা ভারতচন্দ্র বিদ্যাপতির কবিত্বের উল্লেখ করিয়া তাঁহাদিগকে সবংশে ধ্বংস করিতেছেন, কখন বা রবীন্দ্রনাথের মোলাম কবিতার মাধুরীতে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন।

সুরেন্দ্রের আগমন বার্ত্তা প্রচার হইলে প্রজাবর্গ পালে পালে জমীদার দেখিতে আসিতে লাগিল। দেখা কাহারও সঙ্গে বড় ঘটিয়া উঠিল না। দেওয়ানজীর নিকট হইতে রসিদ লইয়া নজরের টাকা দিয়া চলিয়া গেল। বিশেষ অসুবিধা হইবে বুঝিয়া সুরেন্দ্রমোহন নজর প্রদান সম্বন্ধে এইরূপ রসিদের বন্দোবস্ত করিয়াদিলেন।

নজরের টাকায় সুরেন্দ্র অচিরে সমুদয় দেনা শোধ করিলেন; উদ্বৃত্ত ও কিছু রহিল। তাহাতে চৌরঙ্গীতে একটি বাটী ক্রয় করিবেন কি না, সেই পরামর্শ নিরুপমার সহিত আঁটিতে লাগিলেন।

সুরেন্দ্র দিন কয়েক বাড়ীতে থাকিয়া দেওয়ানের সহিত পত্তনি হিসাবে জমীদারীর বন্দোবস্ত করিয়া নিরুপমার পরামর্শমত পূর্ব্বোক্ত পিতৃপালিত কুপোষ্যবর্গকে বিদায় দিয়া সত্বর কলি-

কাতায় ফিরিয়া আসিলেন। হৃদয় মধ্যে মধ্যে বড় সাধ হইতে লাগিল যে, একেবারে স্থায়ী বন্দোবস্ত করিয়া স্বদেশের নিকট হইতে চিরবিদায় লইয়া চলিয়া আসিয়া, কলিকাতায় চিরবাস-স্থান স্থাপন করেন ; কিন্তু নানা কার্য্যে আপাততঃ সে বাসনা পূর্ণ হইয়া উঠিল না। নিরুপমার আন্তরিক ইচ্ছা যে, সুরেন্দ্র সমস্ত বিষয় আশয়, যাহা কিছু আছে, সকলই এককালে সেই ক্ষুদ্র পল্লীগ্রাম হইতে উঠাইয়া একবারে চৌরঙ্গীতে আনিয়া সংস্থাপন করেন ; কিন্তু পোড়া বিধির সংসারে সৌখিনের সখ এবং রসিকের রসেচ্ছা পূর্ণ হয় না।

কলিকাতায় আসিয়া অবধি সুরেন্দ্র নিরুপমার সহিত পূর্ব্ব-বর্ণিত গঙ্গাতীরস্থ উদ্যান বাটিকায় বসবাস করিতেছেন।

অতঃপর সুরেন্দ্রমোহনের ধর্ম্মাধর্ম্মের কথা অল্প অল্প আলোচনা, করিতে হইবে ; নতুবা কৌতূহলী পাঠক পাঠিকার নিকট মার্জ্জনার আশা অল্প। নিরুপমার সহিত বিবাহের পর, সুরেন্দ্র ধর্ম্মাধর্ম্মের আর বড় তোয়াক্কা রাখেন না। পূর্ব্বেও প্রকৃত পক্ষে রাখিতেন কি না, তাহা যাঁহাকে লইয়া ধর্ম্ম তিনিই বলিতে পারেন ; নরলোকের কেহ সে বিষয়ে বড় অভিজ্ঞ নহে। তবে বাহিরে বাহিরে দিন কয়েক কোন বিশেষ ভাবাপন্নও হইয়াছিলেন ; এক্ষণে সে বাহ্য ভাবটুকুও এক প্রকার পরিত্যাগ করিয়াছেন বলিতে হইবে ; মোটের উপর বলিতে গেলে এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, সুরেন্দ্রমোহন বর্ত্তমানের ইয়ংবেঙ্গলের ধর্ম্মাবলম্বী ; অর্থাৎ, সে ধর্ম্মের ব্যাপার যে কি তাহা ঠিক করা স্বয়ং ভগবানের সাধ্যাতীত। সুরেন্দ্র দাঁতে কাটেন চুল রাখেন, মধ্যে মধ্যে হবিষ্যান্ন ভক্ষণ করেন, আবার বাইবেলও আবৃত্তি

করেন, গীতার শ্লোকও মুখস্থ করেন, চুল ছাঁটিয়া বাঁকাসীঁতে কাটেন এবং মৎস্য মাংসেও উদর পরিপূর্ণ করেন; অধিকন্তু এই যে, সুরেন্দ্র কোন কার্য্যেই বিনা যুক্তিতে হস্তক্ষেপ করেন না।

এই ধর্ম্ম-বিড়ম্বনা বা সন্দেহ-বিবর্ত্তে পড়িয়া যখন সুরেন্দ্র বাবু হাবুডুবু খাইতেছেন, তখন রামতারণ বাবুর সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হইল। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীগ্রামে রামতারণ বাবুর বাসস্থল। ছাত্র অবস্থায় তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন বিশেষ মেধাবী ছাত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ দখল ছিল; এখনও সেই নিমিত্ত অনেকের নিকট নিতান্ত অপরিচিত নহেন। তাঁহার পরিচয় তাঁহার অনেক প্রবন্ধে পাওয়া যায়। দার্শনিকগণ বাহ্য-বোধহীন কর্ম্মকাণ্ড বিবর্জ্জিত পণ্ডিতমূর্খ করিয়া চির বিখ্যাত; তবে, আমাদের দেশের দর্শনে মানুষের মন যত বিচলিত হইয়া যায়, পাশ্চাত্য দর্শনে মানুষের অবস্থা ততদূর শোচনীয় হয় না। দেশী দর্শনে মানুষকে সংসারসুখ ভুলাইয়া আত্মহারা করিয়া ফেলে; মিল, কম্‌ট, ক্যাণ্ট প্রভৃতির শক্তি ততটা প্রবল নহে। তাঁহারা বাহিরে বাহিরে একটু বিগ্‌ড়াইয়া দিয়া অন্তর ঠিক্ রাখেন।

পাশ্চাত্য দর্শনের ঝোঁকে মস্তিকে একটু গোলযোগ ঘটিলে, রামতারণ ঠিক্ বলিলেন যে,এই দুনিয়াটা সকলই all are mere illusions কাজ কর্ম্ম, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, ধন ধান্য স্ত্রী পুত্র পরিবার, যাহা কিছু বল না কেন,সকলই বৃথা,সকলই মিথ্যা,কতকগুলা মানসিক ধারণা—mere ideal এক কথায় বর্কলে-হিউম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ যে সত্য বা অসত্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,

রামতারণ দার্শনিক নেশার ঝোঁকে সেই সকল সত্য অসত্য নির্দ্দেশ, স্বীয় জীবনে হাতে কলমে খাটাইবার চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। রামতারণের মস্তিষ্ক উষ্ণতার আরও একটি বিশেষ কারণ ঘটিয়াছিল; রামতারণ যখন অল্পবয়সে পিতৃহীন হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার আর যে একটি কনিষ্ঠ সহোদর ছিল, সে দার্শনিক ঝোঁক একটু বেশীমাত্রায় লাভ করিয়া সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাচ্য প্রথানুসারে সন্ন্যাসপন্থাবলম্বী হইয়াছিলেন। ইহাতে রামতারণের হৃদয়ে একটু বড় কঠিন আঘাত লাগিয়াছিল।

এই দশায় কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, হঠাৎ রামতারণ বাবুর মোহনিদ্রা এক দিন ভঙ্গ হইল। তিনি হঠাৎ উদরের দিকে চাহিয়া দেখিলেন যে, দুনিয়ার কিছুই মিথ্যা নহে; তিনি যাহা ঝিমাইয়া ভাবিতেছিলেন, সেই সকলই মিথ্যা।

রামতারণ যখন উদরান্নের অভাবে অবসন্ন হইয়া পড়িলেন, তখনই তাঁহার এই মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইল; কিন্তু তাহা অতি বিলম্বে ঘটিল। তখন তাঁহার জীবনতরণীর অনেক পাল ছিঁড়িয়াছে, অনেক হাল ভাঙ্গিয়াছে। এই অবস্থায় চৈতন্যোদয় হইলে, দার্শনিক রামতারণ চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। আঁধারে পড়িয়া প্রকৃত পণ্ডিতের ধীরভাবে রামতারণ উদ্ধারের উপায় করিতে লাগিলেন।

রামতারণ বুঝিলেন, সংসারে অর্থই অতি মূল্যবান্ বস্তু; অর্থ ব্যতীত সংসার-সংগ্রামে একপদ অগ্রসর হওয়া যায় না। রামতারণ অর্থ উপার্জ্জনে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু বিচলিত হইলেন না; বীরের ন্যায় ধীরভাবে প্রশান্ত চিত্তে উপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে উমেদার অবস্থায় সুরেন্দ্র-মোহনের সহিত পরিচয় হইল। সুরেন্দ্র আর যাহাই হউন, সময়ে সময়ে ঝুঁটা সাঁচ্চার দর সমঝাইবার হৃদয় কতক তাঁহার আছে। তিনি রামতারণের গুণগ্রাহী হইলেন। পারিষদ্‌রূপে রামতারণকে স্বীয় ক্রোড়ে আশ্রয় দিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

পশ্চিম বঙ্গে সুবর্ণরেখা নদীর তীর বহিয়া বহুদূর যাইতে যাইতে ক্রমে একটি প্রাচীন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ পথিকের নয়ন পথে পতিত হয়। এই ধ্বংসাবশেষ ছাড়াইয়া অপর কিছু দূর যাইলে, পথিক কুশীগ্রামে উপস্থিত হইতে পারেন।

কুশীগ্রাম আজি কালিকার মধ্যে মধ্যবঙ্গের এক অতি বৃহৎ পল্লীগ্রাম। এখানে একটি মধ্য শ্রেণীর মিউনিসিপালিটি সম্প্রতি সংস্থাপিত হইয়াছে। তাহার আশীর্ব্বাদে ধনিগণ বিশুদ্ধ বায়ু, বিশুদ্ধ সলিল সেবন করিয়া সশরীরে স্বর্গসুখ উপভোগ করেন। দরিদ্র অধিবাসীরা ধনিগণের পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা রাশির মধ্যে বসতি করিয়া মিউনিসিপাল ট্যাক্সের বিষম উপদ্রব উৎপীড়ন উপভোগ করিয়া, বিনা বেতনের চেয়ারম্যান ও কমিশনারগণের স্কন্ধের উপর দিয়া, তাহাদের সে ক্ষতি ষোল আনা পূর্ণ করিয়া দেয়।

যে স্থলে কুশীগ্রাম সংস্থাপিত, তাহার নিম্নে সুবর্ণরেখার প্রশস্ততা ২৫।৩০ হাতের অধিক নহে। এই স্থলের অঙ্গ দর্শন করিলে, সুবর্ণরেখাকে বড়ই শীর্ণা ও দরিদ্রা নদী বলিয়া

মনে হয়। আবার উহার তীরস্থ কুশীগ্রামের দরিদ্র অধি- বাসীদিগের অবস্থা দেখিলে, মনে তদপেক্ষা দুঃখের উদয় হইয়া থাকে। সুবর্ণরেখার এই স্থলের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ এতই দরিদ্র যে, সুবর্ণরেখার এই অঙ্গে মোটা থাম বা বৃহৎ অট্টা- লিকার ছায়া দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। সুবর্ণরেখার এই অঙ্গের সলিল ছোট ছোট গোল্‌পাতার ঘরের ছায়ায় আবৃত। কুশীগ্রামের ধনী ও মধ্যবিত্তগণ সুবর্ণরেখার তীর হইতে একটু দূরে বাস করিয়া থাকেন।

সুবর্ণরেখা নদীর তীরস্থ এই সকল ছোট ছোট খড়ের ঘর সমূহের সর্ব্ব দক্ষিণ প্রান্তে একটি সর্ব্বাপেক্ষা অতি ছোট বাড়ী বর্ত্তমান। বাড়ীটির চারিদিক্ মনুষ্যের দৈর্ঘ্য হইতে উচ্চ করিয়া দরমার বেড়া দ্বারা ঘেরা। বেড়ার চারিদিক্ ছোট ছোট জঙ্গলে পরিপূর্ণ। জঙ্গলের উচ্চতা এত অধিক যে, দূর হইতে বাড়ীটি ভালরূপ পথিকের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না।

বাটীর মধ্যে দুই খানি ছোট ছোট গোল্‌পাতার অতি পরিষ্কৃত ঘর। দুই খানির মধ্যে যে খানি একটু বড়, সেই খানি দক্ষিণ দ্বারী; আর ছোট খানি পশ্চিম দ্বারী। বাটীর উঠান টুকু দীর্ঘে প্রস্থে ১০ বর্গহাত। অন্দর টুকু এতই পরি- ষ্কার পরিচ্ছন্ন যে, সিন্দুর বিন্দুটুকু বিনা আয়াসে তুলিয়া লওয়া যায়। উঠানের মধ্যস্থলে একটী ছোট তুলসী বেদী। তুলসী পীঁড়ির পার্শ্বে পূর্ব্ব দিকে দুইটি পেয়ারা গাছ এবং একটি বাতাবি নেবুর গাছ।

সন্ধ্যার ঘোর হইয়া আসিলে, একটি ক্ষুদ্র বালিকা এলো

চুলে হাসিতে হাসিতে এই ছোট বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। বাঁলিকার বয়স আন্দাজ ১২।১৩ বৎসরের ঊর্দ্ধ নহে। আকৃতি দেখিলে দর্শকের মনে এক প্রকার দয়া-মিশ্রিত ভালবাসার উদ্রেক হয়। শরীরের গঠন অতি কোমলতাব্যঞ্জক ও মধুরতাময়, সর্ব্বপ্রকার কঠিন কর্কশ ভাব বিবর্জ্জিত। হাবভাবে বালিকা অতি বিজ্ঞ, শান্ত, প্রকৃতি বৃদ্ধার ন্যায় মৃদু। বদনমণ্ডলে বা চক্ষে চাঞ্চল্যের লেশমাত্র নাই। দেখিলে বোধ হয়, যেন শান্তিদেবী স্বর্গধাম ত্যাগ করিয়া স্বয়ং মূর্ত্তিমতী হইয়া কুশীগ্রামের সেই ক্ষুদ্র কুটীরে উপস্থিত। মস্তকে প্রাবৃটের জলধরের ন্যায় কুঞ্চিত সুদীর্ঘ কেশদাম পদতলে লুণ্ঠিতপ্রায়।

বালিকা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃদুস্বরে ডাকিল,—"দিদি মা, আমি আসিয়াছি।" বৃদ্ধা দিদি মা বাহিরে আসিয়া কহিলেন,—"কুণ্ডলা, এত বিলম্ব কেন? আমি যে আর ভাবিতে পারি না। বুড়ো বয়সে আর এ জ্বালা কি সহ্য হয়?"

বালিকা। আমিও তাহাই ভাবিয়াছিলাম; তাই দৌড়াইয়া আসিতেছি। আমার হাঁফ লাগিয়াছে।

দিদি মা। এখন ঘরে আইস।

কুণ্ডলিনী। কই, তুলসী পীড়িতে আজ প্রদীপ দাও নি?

দিদি মা। তোমার কাজ আর আমি কি করিব। তুমি দাও নাই কেন? এখন যাও, পীড়িতে দীপ দিয়া গড় করিয়া ঘরে আইস।

এই কথার পরে দিদি মা ঘর হইতে ছোট একটি প্রদীপ জ্বালিয়া আনিয়া কুণ্ডলার ছোট রক্তাভ করে প্রদান করিলেন। কুণ্ডলা তুলসী-মণ্ডপে প্রদীপ রাখিয়া, প্রণাম করিয়া ফিরিয়া

আসিয়া দিদি মার পদধূলি লইয়া, স্বীয় শিরে প্রদান করিল। দিদি মা আশীর্ব্বাদ করিলেন,—"কুল শীল বজায় রাখ।"

কুণ্ডলা গৃহে প্রবেশ করিল। দিদি মা পশ্চাতে আসিয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

গৃহের মধ্যে পশ্চিম প্রান্তে একখানি ছোট তক্তাপোষ। তক্তাপোষের উপরিভাগে একটি ছোট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন শয্যা। পূর্ব্বপ্রান্তে এক খানি লম্বা চৌকী; তাহার উপরিভাগে একটি পিত্তলের কলসী, একটি ঘটী ও থান কয়েক অতি সুমার্জ্জিত থালা ও বাসন, দুইটি বাটী ও একটি গ্লাস সুসজ্জিত। আবার জিনিষ পত্রের মধ্যে দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে একটি সিকায় ২।৩টি ছোট ছোট হাঁড়ি ঝুলিতেছিল মাত্র।

কুণ্ডলা গৃহমধ্যে আসিয়া বিছানায় বসিয়া পড়িল। দিদি মা দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া এক খানি ছোট হাতপাখা লইয়া কুণ্ডলাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। ক্ষণ পরে উঠিয়া সিকার হাঁড়ি হইতে খাদ্য বাহির করিয়া কুণ্ডলার হস্তে প্রদান করিলেন। কুণ্ডলা ধীরে ধীরে ভক্ষণ করিতে লাগিল। দিদি মা পুনরায় পার্শ্বে বসিয়া কুণ্ডলার গাএ হাত বুলাইতে লাগিলেন। কুণ্ডলার আহার সমাপ্ত হইল। দিদি মা জিজ্ঞাসা করিলেন,— "গুরুদেব কি এক্ষণে ফিরে এসেছেন?"

কুণ্ডলা। গুরুদেব আর বলাই দাদা দুইজনেই ফিরে এসেছেন। বলাই দাদা এখনি এখানে আস্‌বে।

দিদি মা। ঠাকুর তোমায় আজ কি কি কথা বল্লেন?

কুণ্ডলা। প্রথমে এসেই তোমার কথা জিজ্ঞাসা কল্লেন; পরে আমায় একটু বক্‌লেন।

দিদি মা। তোমায় বক্‌লেন কেন ?

কুণ্ডলা। আমি দিনমানে আজ একটু বাটীর বাহিরে গিয়েছিলেম বলে।

দিদি মা। তুমি বলিলেই পারিতে যে, বলাই তোমায় লইয়া গিয়াছিল।

কুণ্ডলা। তাহা আমার বলিবার দরকার হয় নাই, বলাই দাদা তাহা নিজেই বলেছিলেন। বলাই দাদাকে তাই ত্রিরাত্র উপবাসী থাকিতে আদেশ করিলেন।

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে পদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল।

দিদি মা জিজ্ঞাসা করিলেন "কে বাহিরে ?"

বাহির হইতে উত্তর হইল,—"সন্তানঃ।"

দিদি মা। বলাই ? গৃহ মধ্যে আইস।

দিদি মা উঠিয়া দ্বার খুলিলেন। বলাই গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বলাইএর বেশ ভূষা সন্ন্যাসীর ন্যায়। বলাইএর বসন গেরুয়া, কেশ ও শ্মশ্রুগুচ্ছ দীর্ঘ এবং রুক্ষ। সুন্দর সুগঠিত শরীর—অল্প শীর্ণ; কিন্তু তেজোময়। দেহ উন্নত; ললাট প্রশস্ত,উজ্জ্বল। চক্ষু উৎসাহপূর্ণ, প্রশান্ত; মুখমণ্ডল দৃঢ় প্রতিভার লীলাক্ষেত্র স্বরূপ। বলাইএর বাহ্য আকৃতি ও আনুষঙ্গিক হাব ভাব দেখিলে, বোধ হয়, যেন বলাই কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে জীবন পণ করিয়া মর্ত্ত্যলোকে বিচরণ করিতেছেন। এইরূপ উদ্দেশ্যময় মহাপুরুষগণ প্রায়ই বাহ্যজ্ঞান এবং আত্মসুখ বিরহিত। বলাইয়েরও সেই দশা; কিন্তু তাই বলিয়া বলাই অবশ্য নির্ব্বোধ নহেন; অনেক নির্ব্বোধ, কিন্তু এইরূপ মহাত্মাদিগকে নির্ব্বোধ বলিয়া মনে করে।

বলাই ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াই দিদি মার দক্ষিণ পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। বসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কুণ্ডলা কোথা ?" কুণ্ডলা দিদি মার বামপার্শ্ব হইতে ভীতিব্যঞ্জক মৃদু স্বরে কহিল,—"এই যে আমি, এইধারে বসিয়া আছি।" বলাই ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে কহিলেন,—"কুণ্ডলা, তুমি কি দিন দিন এইরূপে শিষ্টতা শিক্ষা করিতেছ ?"

কুণ্ডলা সঙ্কুচিত ভাবে উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া অপ্রতিভ ভাবে বলাই দাদাকে প্রণাম করিয়া এক পার্শ্বে চোরের মতন কুণ্ঠিত ভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

বলাই কহিলেন,—"আর দাঁড়াইয়া রহিয়াছ কেন ? এক্ষণে বসিতে পার। দেখিও কুণ্ডলা সাবধান, গুরুদেব তোমায় যে নীতি শিখাইয়াছেন, তাহা যেন সর্ব্বদা মনে জাগরুক থাকে।"

কুণ্ডলা উপবেশন করিল। দিদি মা কহিলেন,—"বলাই, কুণ্ডলার বয়স ত তুমি অবগত আছ; কিছু মনে করিও না।" বলাই বিরক্ত ভাবে উত্তর করিলেন,—"স্নেহের দৃষ্টিতে শত বর্ষের বৃদ্ধ সন্তানও দুগ্ধপোষ্য শিশুর ন্যায় ক্ষুদ্র। দিদিমা হাসিয়া কহিলেন,—"বলাই, তবে কুণ্ডলা কি শত বর্ষের বৃদ্ধ হইয়াছে ?"

বলাই পূর্ব্বের তেজপূর্ণ বাক্যে গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—"আমার কথার তাৎপর্য্য অন্যরূপ। আমার কথার উদ্দেশ্য এই যে, কুণ্ডলা এক্ষণে গুরু উপদেশে আস্থা প্রদানের উপযুক্ত বয়স্কা।"

দিদি মা এই কথা সহ্য করিতে পারিলেন না। বাঘিনীর ন্যায় গর্জ্জন করিয়া কহিলেন,—"কুণ্ডলা, তুই আদিত্য বংশের যোগ্যা

কন্যা। তোর গুরু উপদেশে আস্থা নাই?" নিরীহ শিশুসন্তানের প্রতি পিতা মাতা উভয়ে কুপিত হইয়া ভৎ'সনা করিলে, তাহার যে দশা ঘটে, কুণ্ডলার সেই দশা ঘটিল। কুণ্ডলা রোদন করিতে করিতে দিদি মার চরণ ধরিল। দিদি মা বলপূর্ব্বক চরণ আকর্ষণ করিয়া লইয়া কহিলেন,—"তুমি দূর হও। তোমার মুখ আর দেখিতে পারিব না।" কুণ্ডলা দূরে সরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলাইএর পদযুগল জড়াইয়া ধরিয়া কহিল,—"বলাই দাদা, অদ্য আমায় ক্ষমা করুন। আমি আর কখন কোন বাহিরের লোকের সহিত আলাপ করিব না।"

বলাই গম্ভীরভাবে ক্ষমা করিয়া কহিল,—"উঠিয়া ব'স।" দিদি মা নীরবে রহিলেন। কিছুক্ষণ পরে জিজ্ঞাসা করিলেন,— "বলাই, গুরুদেব কি নিজে কুণ্ডলাকে অপরের সহিত কথা কহিতে দেখিয়াছেন?"

বলাই কহিলেন,—"সকল কার্য্যই তিনি হস্তস্থিত আমলকের ন্যায় প্রত্যক্ষ করেন। জগতের সকল ঘটনাই যেন তাঁহার নখদর্পণে বিরাজিত। তিনি যাহার প্রতি যে দোষ আরোপ করেন, তাহা যেন তিনি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, এমনই সত্য বলিয়া অনুমতি হয়। কোথায় কি রূপে যে তিনি সন্ধান পান, তাহা ভগবানই বলিতে পারেন।"

বৃদ্ধা সভয়ে কহিলেন,—"তিনি তবে সত্যই কুণ্ডলার প্রতি বিরক্ত হইবেন। বলাই গম্ভীরভাবে কহিল,—"তিনি কি তুলার ন্যায়—ফুৎকারে উড়িবার ন্যায় লঘু পদার্থ; তিনি মহাশৈল সম, প্রবল ঝড়েও তাহার কেশাগ্রও বিকম্পিত হয় না। ভয় নাই, চিন্তা করিবার কোন কারণ নাই। কুণ্ডলার প্রতি তাঁহার

স্নেহ অকৃত্রিম। ঠাকুরের দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত আপাততঃ কুণ্ডলাকে গৃহের বাহিরে যাইতে দিবেন না। এই বলিয়া বলাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বৃদ্ধা কহিলেন,—"বলাই, কিছু আহার করিয়া যাও।" "তিন দিবস কিছুই খাইবার যো নাই।" এই বলিয়া বলাই চলিয়া গেল। দিদি মা দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।
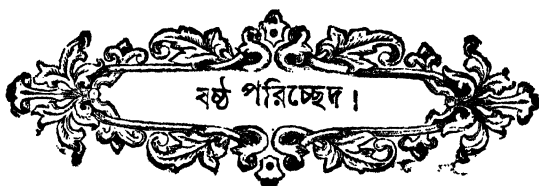
কুশীগ্রামের নিকট সুবর্ণরেখা হইতে একটি ছোট সরিৎ বহির্গত হইয়া উত্তরমুখে এক নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই স্থানটির উভয় তীরই ছোট বড় জঙ্গলে আচ্ছন্ন। এই সকল জঙ্গলের মধ্যে ৩।৪ ক্রোশ ব্যবধানে কতিপয় প্রাচীন গ্রামের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাইয়া যায়। এই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে যে সকল প্রাচীন অট্টালিকার নির্ম্মাণ-কৌশল পরিদৃষ্ট হয় তাহাতে বোধ হয় যে, উক্ত গ্রাম সকল মুসলমানগণের অভ্যুদয়ের সময়ে বর্ত্তমান ছিল। এই সকল প্রাচীন গ্রামের পার্শ্বে যে সকল গ্রাম বিরাজিত, তন্মধ্যে কুশীগ্রাম আধুনিক; সুতরাং, আধুনিকের ন্যায় বাহ্য আড়ম্বর বিশিষ্ট।

কুশীগ্রাম ছাড়াইয়া বলাই একটি অপ্রশস্ত কাননাভ্যন্তরস্থ পথে চলিলেন। চলিতে চলিতে বলাই রামপ্রসাদী সুরে গুন্ গুন্ করিয়া একটি গান গাইতে আরম্ভ করিলেন। গান গাইতে গাইতে কিছু দূর আসিয়া নিবিড় জঙ্গলের মধ্যস্থ এক বৃহৎ বটবৃক্ষতলে বলাই উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়া বটবৃক্ষতলস্থ ব্যাঘ্রচর্ম্মে উপবিষ্ট দীর্ঘকায় জটাজূট বিভূষিত

গুরুদেবকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া করযোড় করিয়া তাঁহার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। অপরাধী আসন্ন দণ্ডাজ্ঞার অপেক্ষায় যে ভাবে দাঁড়াইয়া থাকে, বলাই সেই ভাবে দৃষ্টি-পাত করিয়া রহিলেন।

গুরুদেব গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"এ তোমার কিরূপে প্রেমের শিক্ষা বলাই? এরূপ গুরুভক্তির দীক্ষা তুমি কোথায় লাভ করিয়াছ?" এই মাত্র কহিয়া গুরুদেব নীরব হইলেন। গুরু-দেবের চক্ষে তড়িৎ বিস্ফারিত হইল। বলাইএর ক্ষুব্ধ হৃদয়ে প্রবল ঝটিকা উপস্থিত হইল। যে ঝড়ের বেগ ধারণে অসমর্থ হইয়া বলাই কাঁদিয়া ফেলিলেন; পরে একটু আত্মসম্বরণ করিয়া গুরুদেবের পদতলে যাইয়া কাঁদিয়া পড়িলেন। পড়িয়া কহিলেন,— "গুরো, আমার ন্যায় অধম ব্যক্তি যে, জীব-শিষ্য হইবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত, তাহা বিশেষ বুঝিয়াছি। জানিয়াছি, আমার ন্যায় অসার চঞ্চল ব্যক্তির দ্বারা কোন্ মহৎ কার্য্য সাধিত হইতে পারে না। এক্ষণে অমি বিদায় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। বৃথা এ আশ্রমকে কলুষিত করিতে ইচ্ছা করি না।"

গুরুদেব অধিকতর গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"যথার্থই বলিয়াছ। তোমার ন্যায় অস্থির প্রকৃতি সংজ্ঞাহীনের সংস্রবে যথার্থই আশ্রম কলুষিত হয়। তোমাকে বিদায় দিতে আমার আর কোনই আপত্তি নাই। কিন্তু একটি কথা মনে পড়ে কি? তোমার সেই প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ আছে কি?" বলাই উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন,—"যাহার অস্তিত্ব নাই তাহার আবার প্রতিজ্ঞা কিসের? আমায় বিদায় দিন, আমি অরণ্যের ক্ষুদ্র জন্তু আরণ্য জন্তু অপেক্ষাও অধম—আমি মানব সমাজের

অপেক্ষা পশু-সমাজেরও যোগ্য নাই; আমি ক্ষুদ্র কীট হইতেও ক্ষুদ্রতর। আমায় বিদায় দিন, শৃগাল গৃধিনীর উদর পূর্ণ করাই এ দেহের উপযুক্ত কার্য্য।" এই বলিয়া বলাই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। গুরুদেব আজ্ঞা করিয়া কহিলেন,—"অসার অধম জীব! ক্ষান্ত হও।" শুনিয়া বলাই প্রস্তর পুত্তলিকার ন্যায় স্থির নিষ্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন।

গুরুদেব উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন,—"বারুণি! এইখানে আইস।" গুরুদেবের ডাকের সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বস্থ কুটীর হইতে একটি সন্ন্যাসবেশধারিণী যোগিনী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

যোগিনী যৌবনসীমার মধ্যপথে পদার্পণ করিয়াছেন মাত্র। যোগিনীর যৌবন-জোয়ারের প্রথম আবেগ এক্ষণে ভাঁটার দশায় পড়িবার উপক্রম করিতেছে মাত্র; কিন্তু যোগিনীর তাহাতে দৃক্‌পাত নাই। যোগিনী আপন তেজে আপনি তেজোময়ী, আপন গর্ব্বে আপনি গর্ব্বিতা। যোগিনী আপন ভাবে বিভোর হইয়া শান্তি ও মধুরতায় হিল্লোলে ভাসমানা। যোগিনী মানবীরূপে এক অসামান্যা রমণী। তাঁহাকে দেখিলে, দেবীর ন্যায় ভক্তি করিতে ইচ্ছা হয়—এই কথাতেও বোধ হয় যোগিনীর রূপের ও গুণের যথেষ্ট বর্ণনা হইতে পারে।

যোগিনী গুরুদেবের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে, গুরুদেব কহিলেন,—"বারুণি, বলাইএর কার্য্য কলাপের কথা শুনিয়াছ?"

বারুণী স্থিরভাবে কহিলেন,—"হাঁ শুনিয়াছি।"

গুরু। এক্ষণে কি কর্ত্তব্য তুমি বোধ কর?

বারুণী ভীত হইয়া অধোবদনে রহিলেন। গুরুদেব বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"পাপিয়সি! সত্বর উত্তর প্রদান কর।"

বারুণী নীরবেই রহিল। গুরুদেব কহিলেন,—"পাপিয়সি! যাও, স্বস্থানে যাইয়া উপবেশন করিয়া রহ; আমার সম্মুখে আর আসিও না।"

বারুণী সিংহবিতাড়িতা হরিণীর ন্যায় উদ্বিগ্ন চিত্তে কুটীরে আসিয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন।

গুরুদেব বলাইকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বলাই, মনে করিও না যে, আমি তোমার হস্তে সামান্য ক্রীড়াপুত্তল মাত্র। জান, তুমি আমার নিকট কি প্রতিজ্ঞায় জীবন আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছ? সে প্রতিজ্ঞার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ক্ষমতা এখন আর তোমার রাজা বা কোন দেবতারও নাই। তুমি আমার বন্দী; তুমি বিদায় পাইবে না। যাও, এক্ষণে কুশী গ্রামে যাইয়া এক বৎসর কাল বৃদ্ধার বাটীতে অবস্থান কর। এই সময়ের মধ্যে কুণ্ডলিনীকে মহাভারত ও গীতা অধ্যয়ন করাইতে নিযুক্ত থাক এবং নিজে ভীষ্মচরিত্র সবিশেষ অধ্যয়ন করিও। বৎসরান্তে বিহিত আদেশ পাইবে।"

বলাই সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া আশ্রম ত্যাগ করিলেন।

গুরুদেব উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া কহিলেন,—"শিষ্যগণের মধ্যে কে কে জাগ্রত আছ?" কথা সমাপ্তির সহিত ৯।১০ জন সন্ন্যাসবেশী যুবক আসিয়া উপস্থিত হইল।

গুরুদেব কহিলেন,—"আরও এক বর্ষকাল তোমাদিগকে এই স্থানে থাকিতে হইবে। বলাইএর হৃদয়ক্ষেত্রে অদ্য মহাশীলার মন্ত্র বীজ রোপণ করিলাম; সে বীজ এক বর্ষে অঙ্কুরিত হইবে। বলাইকে কুশীগ্রামের বৃদ্ধার বাটীতে বাসের নিমিত্ত প্রেরণ করিয়াছি।

তোমরা অতি সাবধানে তাহার কার্য্যকারিতার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখিও।”

অনেক শিষ্য উত্তরে কহিল,—“বলাইএর জন্য প্রভুকে বিশেষ চিন্তা করিতে হইবে না। বলাইএর হৃদয় যদিও যৌবনসুলভ সংসারিকের ন্যায় চঞ্চল; কিন্তু মহত্ত্ব ও পবিত্রতার আলয়।”

গুরুদেব হাসিয়া কহিলেন,—“নির্ব্বোধ বালক তোমরা! মনুষ্য হৃদয়ের গতি বিধি বুঝিতে তোমাদের এখনও বিস্তর বিলম্ব আছে। যেমন আকর হইতে তুলিয়া অনেক পোড় খাওয়াইয়া সুবর্ণকে বিশুদ্ধ করিতে হয়, তেমনি মানবকেও সংসারের বিবিধ প্রকার কার্য্যক্ষেত্রে পরীক্ষা প্রদানানন্তর বিশুদ্ধ হইতে হয়। বলাইএর হৃদয় বিশুদ্ধ সুবর্ণ; কিন্তু এখনও আকরস্থ মৃত্তিকাদির সহিত জড়িত রহিয়াছে।”

অপর একজন শিষ্য কহিল,—“বলাই কি তবে আর আমাদের সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে পাইবে না?”

গুরুদেব। এক বৎসরের নিমিত্ত বলাইএর দ্বীপান্তর হইয়াছে, মনে করিও।

শিষ্য। তবে কি বৃন্দার বাটীতে আমরা প্রকাশ্য ভাবে যাইতে পারিব না?

গুরু। না! প্রকারান্তরে বলাইএর কার্য্যকলাপে প্রতি তোমরা দৃষ্টি রাখিবে। সকল শিষ্যবর্গ “যথা আজ্ঞা” বলিয়া শিরনত করিল। গুরুদেব কহিলেন,—“এক্ষণে তোমরা নিজ নিজ স্থানে গমন কর।” আজ্ঞা পাইয়া সকলে প্রস্থান করিল। গুরুদেব আড়াল হইতে রেবতীর উপবেশন অবস্থা দেখিয়া আসিয়া স্বয়ং ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।
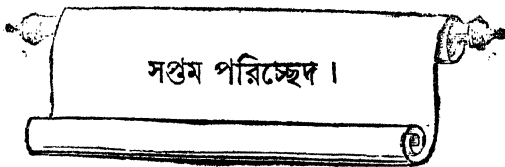
রাত্রি প্রভাত হইলে বৃদ্ধা কুণ্ডলাকে উঠাইয়া নিজে গৃহের বাহিরে আসিলেন। আসিয়া দেখিতে পাইলেন, অঙ্গনে বলাই নীরবে উপবেশন করিয়া রহিয়াছে।" দেখিয়া বৃদ্ধা আশ্চর্য্যান্বিতা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলাই, এ কি, আবার এ সময়ে কেন আসিয়াছ?"

বলাই গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"মা, সে অনেক কথা; আহারান্তে সকল বলিব।"

কুণ্ডলা গৃহ হইতে বাহিরে আসিয়া বলাইএর হস্ত ধারণ করিয়া কহিল,—"দাদা, ঘরে আসুন।" এই বলিয়া কুণ্ডলা বলাইএর হস্ত ধরিয়া টানিয়া ঘরের মধ্যে লইয়া গেল। বলাই উপবেশন করিলে, কুণ্ডলা দেখিল, বলাইএর প্রশান্ত গণ্ড স্থলে মৃদু মৃদু অশ্রু বিন্দু পড়িত হইতেছে। কুণ্ডলা বালিকাসুলভ চঞ্চল ভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"বলাই দাদা, কাঁদিতেছ কি জন্য?"

এমন সময় বাহির হইতে কে ডাকিয়া কহিল,—"কুণ্ডলা! এক বার বাহিরের দিকে আইস।"

বৃদ্ধা কহিলেন,—"তুমি কে, কুণ্ডলাকে ডাকিতেছ?"

বাহির হইতে উত্তর হইল,—"দেখিলে চিনিতে পারিবেন।

আমার বাড়ীর ভিতর যাইবার উপায় নাই। সে উপায় থাকিলে আপনাকে বিরক্ত করিতাম না।"

দিদি মা বাহিরে গমন করিলেন। যাইয়া, লোকটিকে চিনিতে পারিলেন।

আগন্তুক কহিলেন,—"কুণ্ডলাকে বিশেষ সাবধানে রাখি-লেন। দেখিবেন, সে যেন একাকী কখন বাটীর বাহিরে গমন না করে। আর একটি কথা আপনাকে বলিতে আসি-য়াছি। গুরুদেব বলাইকে অদ্য হইতে এক বৎসর যাবৎ এই স্থানে থাকিতে আদেশ করিয়াছেন। তাঁহাকে এক বৎসর এই স্থানে থাকিতে হইবে। গুরুদেবের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।" এই বলিয়া আগন্তুক ২০৲ টাকার ৫ কেতা নোট বৃদ্ধার হস্তে প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা আর কোন মৌখিক দুঃখ প্রকাশ না করিয়া নীরবে বাষ্পবারি মোচন করিলেন।

আগন্তুক কহিলেন,—"আক্ষেপ করিবার কোন কারণ নাই। ইহা আপনার গুরুদেবের সম্পত্তি গ্রহণ করা হইতেছে বলিয়া মনে করিবেন না। এ অর্থ গুরুদেবের নিজের নহে। আপনাদের যে ধন সম্পত্তি তাঁহার হস্তে ন্যস্ত রহিয়াছে, এই একশত মুদ্রা তাহারই মধ্য হইতে প্রদত্ত হইল।" বৃদ্ধা এই কথা শুনিয়া কিছু বিস্মিত হইয়া রহিলেন।

আগন্তুক কহিলেন,—"আপনি যাইয়া, সত্বর একবার কুণ্ডলাকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিন। আমি তাহাকে কিছু বলিয়া যাইব।"

বৃদ্ধা দ্রুতপদে চলিয়া আসিয়া কুণ্ডলাকে আগন্তুকের নিকট

পাঠাইয়া দিলেন। কুণ্ডলা আসিয়া আগন্তুককে প্রণাম করিয়া বসিতে পীঁড়া দিল।

আগন্তুক কহিলেন,—"কুণ্ডলা, গুরুদেব আদেশ করিয়াছেন, তোমাকে আর আশ্রমে যাইতে হইবে না।" কুণ্ডলা এই কথা শুনিয়া একটু বিস্মিত এবং একটু বিষণ্ণও হইল।

আগন্তুক কুণ্ডলার মনের গতিক বুঝিয়া কহিলেন,—"কুণ্ডলা! তুমি জান, কি কোন্ দেশে তোমার জন্ম হইয়াছে?"

কুণ্ডলা মনে মনে কহিল,—"এ সকল কি প্রশ্ন?"

কুণ্ডলাকে নীরব দেখিয়া আগন্তুক কহিলেন,—"কুণ্ডলা, বঙ্গের মধ্যে প্রাচীন রাজবংশে তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ। হয় ত, এমন দিন কখন তোমার রমণী-জীবনে আসিলে আসিতে পারে, যখন তোমায় স্বয়ং রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে হইবে; তখন অনেক লোক তোমার পক্ষে পুত্রের স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইবে। এই সময় হইতে সকলকে পুত্র কন্যার ন্যায় স্নেহচক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হওয়াই তোমার প্রধান শিক্ষা। বাল্যক্রীড়ার সময় তোমার এখন অতীত হইয়াছে। অদ্য হইতে এক বর্ষকাল তোমাকে 'ভ্রাতা' বলাইএর শিক্ষাধীনে থাকিতে হইবে। বলাই এক্ষণে তোমার শিক্ষাগুরু। শিক্ষায় অমনোযোগ প্রদর্শন করিলে, গুরুদেব বড় রুষ্ট হইবেন। এক্ষণে গৃহে গমন কর। আমিও চলিলাম।" এই বলিয়া আগন্তুক যাইতে উদ্যত হইলে কুণ্ডলা কহিল,—"বেলা অধিক হইয়াছে, এ বেলার আহারাদি এই বাটীতে সমাপন করিয়া যাউন।"

আগন্তুক কহিলেন,—"না, বিশেষ কারণ আছে; আমায় এখনি যাইতে হইবে।" এই বলিয়া আগন্তুক চলিয়া গেলে,

কুণ্ডলা অন্যমনস্ক হইয়া সেই স্থলে দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল। প্রায় দুই দণ্ড কাল কুণ্ডলা শারদীয় সন্ধ্যায় পশ্চিম গগন-বিরাজিত নিবিড় মেঘখণ্ডের ন্যায় স্থির ভাবে সেই স্থলেই দাঁড়াইয়া রহিল। পরে গুরু গম্ভীরভাবে ধীরে ধীরে কুণ্ডলা গৃহ মধ্যে ফিরিয়া আসিল। সে মুহূর্ত্তে কুণ্ডলার বালিকা মূর্ত্তি যেন চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল।

কুণ্ডলা গৃহমধ্যে আসিয়া গম্ভীরস্বরে বলাইকে জিজ্ঞাসা করিল,—"বলাই দাদা, বলিতে পারেন, রেবতী দিদি কি বিধবা ?"

প্রশ্নে বলাইএর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল। বলাই একটু ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কি উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কুণ্ডলা আবার ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—"বলাই দাদা, আপনি কি তাহার সম্বন্ধে কিছু জানেন ?" বলাই ঈষৎ বিরক্তির সহিত কহিলেন,—"এ সকল অনাবশ্যকীয় অসংলগ্ন প্রশ্নের প্রয়োজন কি কুণ্ডলা ?"

বলাইএর এই কথা শুনিয়া কুণ্ডলার গম্ভীর মূর্ত্তি আরও গম্ভীরতর হইয়া উঠিল। কুণ্ডলার মুখে আর সে বালিকোচিত সরল ও চাঞ্চল্য ভাব নাই। কুণ্ডলার মূর্ত্তি আজ অতি ধীর, অতি স্থির, অতি গম্ভীর।

এইরূপেই মানুষের প্রকৃতি কোন কোন অবস্থায় এক মুহূর্ত্তেই পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। শত দিনে, শত মাসে যে প্রকৃতির পরিবর্ত্তন ঘটে না, হয় ত এক দিনের, এক মুহূর্ত্তের, এক কথায়, একই ঘটনায় সেই প্রকৃতি একবারে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। এইরূপেই মানবদেহধারী দানব দেবতায় পরি-

পণ্ড হয়, আবার দেবোপম মানবও ভীষণ পিশাচের প্রকৃতি ধারণ করে। রত্নাকর দস্যু এইরূপেই মহর্ষি বাল্মীকি এবং সদাশয় ম্যাক্‌বেথ এইরূপেই ডন্‌ক্যান-ঘাতকে পরিণত হইয়াছিলেন। দর্পী মানব! তুমি প্রকৃতির ক্রীড়াপুত্তল মাত্র।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।
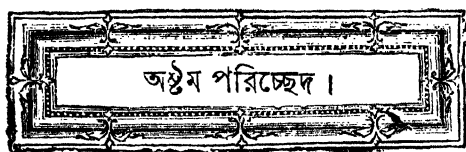
একদা এক মহাত্মাকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল যে, এ সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী জীব কোন্ ব্যক্তি?" মহাত্মা প্রত্যুত্তরে বলেন,—"যে ব্যক্তি অসার বোধে সংসার-বাসনা ত্যাগ করিয়াছে, অথচ পরলোকে বিশ্বাস সংস্থাপন করিতে পারে নাই, জগতে সেই হতভাগ্যই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী জীব।" প্রশ্নটি যেমন গুরুতর, উত্তরও তদনুযায়ী সুন্দর।

সুরেন্দ্র বড় ভুক্তভোগী জীব। তিনি এ কথার সারত্ব বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং এক্ষণে বিষম সন্দেহের তরঙ্গে পড়িয়া বড়ই নাকানি চোবানি খাইতেছেন, আর দুনিয়ার চারি দিকে কেবল এক ভীষণ ধূমজালেরকুজ্ঝটিকা দেখিতেছেন। তাঁহার আর সংসারে বাসনা নাই, লোক সমাজের প্রতি ভালবাসা নাই, নিজ জীবনেও বড় যত্ন এবং আস্থা নাই; তাঁহার ধারণা হইয়াছে, দুনিয়াদারীও ভোগাসক্তি মাত্র; এমন অবস্থায় মরিলেই বা ক্ষতি বৃদ্ধি কি? আর বড় আশ্চর্য্যের কথা, সুরেন্দ্রের পরলোকের ভয়ভাবনা নাই—ঈশ্বরেও বিশ্বাস ঠিক্ নাই। সুরেন্দ্রের কেন এমন হইল? ইহার কি আবার

একটা কৈফিয়ৎ পাঠক মহাশয়কে নিতান্তই দিতে হইবে? তাহা হইলে, গ্রন্থকারের একটা বড় দুর্ভাগ্যের কথা বলিতে হইবে।

সুরেন্দ্র বড় অধ্যয়নপ্রিয় লোক ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়নের বড়ই ঝোঁক ছিল। সেই ঝোঁকের টানে পড়িয়া তিনি মিল, কম্‌ট, ক্যাণ্ট প্রভৃতির কত কি পুস্তক পড়িয়া ফেলিয়াছেন। আবার এ সকল ছাড়া সুরেন্দ্রমোহন সাঙ্খ্য পাতঞ্জলের ইংরাজী তর্জ্জমাও পড়িয়াছেন। পাঠক বুঝিয়াছেন কি, সেই কারণেই যেমন আজি কাল দশ জন ভদ্রলোকের ছেলে পিলের যেমন হইয়া থাকে, তেমনিই তাঁহারও ভাগ্যে এ দশা ঘটিয়াছে।

সুরেন্দ্র আজি কালি প্রায় গৃহে থাকেন না। দিনমানে ১০।১২ ঘণ্টা গঙ্গাতীরে, উদ্যানে বা নিকটস্থ পল্লীতে বেড়াইয়া কাটাইয়া দেন। রাত্রিকালেও প্রত্যহ প্রায় এগারটা বাজিয়া গেলে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ জলযোগ মাত্র করিয়া বাহিরের বৈঠকখানায় শয়ন করিয়া থাকেন।

এ কারণে সুরেন্দ্র মনে মনে যাহাই হউন, তাহা ভগবান্‌ই জানেন, আর সুরসিক পাঠক পাঠিকাই বুঝিতে পারেন। বাহিরে উক্ত ‘সম্ভ্রান্ত মহিলা’ বড়ই দুঃখিতা এবং প্রকাশ্যে তাঁহারই ভূতপূর্ব্ব প্রেমদাস ‘ভ্রাতাকে’ দুঃখের কথায় প্রেমের জমা খরচ বুঝাইতে সময়ে সময়ে বড় ত্রুটিও করেন না।

একণে এক প্রকাণ্ড পণ্ডিত মূর্খ জীবে পরিণত হইয়াছেন। কুহকিনীর কুহক কাঁদুনীতে সময়ে সময়ে আজিও একটু গলিয়া যান। তবে প্রভেদের মধ্যে কাঁদুনীতে এখন আর বড় একটা

স্রোত গড়ায় না, বা বিশেষ জমাটাও বাঁধে না; উভয়ের শুষ্ক হৃদয়ে চুপ্‌সাইয়া যায়। এই দশায় পড়িয়া কাহারও কথাবার্ত্তা সুরেন্দ্রের নিকট বড় ভাল লাগে না। যে নিরুপমার পদে সুরেন্দ্র একদিন স্বীয় ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল উৎসর্গ করিয়াছেন, সেই নিরুপমা এখন তাঁহার নিকট যেন বিষম নাগপাশ স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আহাম্মুখ শিবদাসের সহবাস এক্ষণে তাঁহার পক্ষে শত সহস্র মশা ছারপোকার দংশনবৎ হইয়া উঠিয়াছে। পক্ষান্তরে, শিবদাস আবার তাঁহাকে বাতিকগ্রস্ত বা অর্দ্ধক্ষিপ্ত মনে করিয়া আজি কালি একটু ফাঁকে ফাঁকে ঘুরিতেছে। ফাঁকা রঙ্‌ তামাসা যাহার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ও অবলম্বন, তাহার নিকট সুরেন্দ্রের মর্ম্মকথা, উন্মাদের বায়ুরোগ—পাগলের প্রলাপ ব্যতীত আর কি বোধ হইতে পারে? কিন্তু তথাপি সুরেন্দ্রের প্রতি আহাম্মুখ শিবদাসের আন্তরিক বন্ধুত্বের লোপ কিছুমাত্র হয় নাই। বিলাসিনী রমণীকে বিবাহ করার নিমিত্ত এবং বর্ত্তমান অবস্থায় পতিত হওয়ায়, যদিও তাঁহার প্রতি শিবদাসের কিছু বিরক্তি জন্মিয়াছিল; কিন্তু তথাপি তাহার হৃদয়ের অকৃত্রিম মিত্রতাভাব ক্ষণেকের নিমিত্তও কিছুমাত্র বিচলিত হয় নাই। এই কারণেই শিবদাস প্রকৃত বন্ধুর ন্যায় মধ্যে মধ্যে সুরেন্দ্রমোহনের মানসিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের নিমিত্ত আসা যাওয়া করিয়া থাকে। সুরেন্দ্রের পক্ষে এক্ষণে সংসার মনুষ্যহীন নীরস মরুভূমি সদৃশ। সংসারের পক্ষেও সুতরাং তিনি মানব-কায়ার ছায়া মাত্র।

হতভাগ্য সুরেন্দ্রের এ সংসারে কেহ নাই কেন? তাঁহার ত অর্থ আছে, রূপ আছে, মানসিক বিদ্যা বুদ্ধি, মিষ্ট ভাষা,

শিষ্টাচার প্রভৃতি অনেক অসাধারণ গুণই আছে। তবে তাঁহার এ সংসারে কেহ 'আহা' বলিবার নাই কেন? কেননা, সুরেন্দ্রের হৃদয়ে ভালবাসা নাই। তাই সুরেন্দ্রের আজি মনের মানুষ নাই, হৃদয়ের বন্ধু নাই; তাই সুরেন্দ্রের জীবনের সাথী, সংসারের আশ্রয় স্তম্ভ, জুড়াইবার স্থল নাই; কাজেই, তাঁহার সকল থাকিয়াও কেহই নাই।

ভালবাসা! তুমিই এ উত্তপ্ত সংসারে একমাত্র শান্তি, আর তোমার যিনি উপদেষ্টা তিনিই যথার্থ গুরু; গুরু—এ নীরস সংসার মরুভূমি তিনি ভিন্ন আর কেহই হইতে পারে না। তোমাকে যিনি দীক্ষা দিতে সমর্থ, তাঁহাকে শত সহস্র প্রণাম।

বৈঠকখানার ক্লকে টং টং করিয়া এগারটা বাজিয়া গেল। অনন্ত কাল মানুষের হাতে কৃত্রিম আকার ধারণ করিয়া যেন ধীরে ধীরে বলিলেন,—"আজিকার মত আমি তবে যাইবার যোগাড় করি।" মানব তাহা শুনিয়াও শুনিল না, আপন ভাবে আপনি বিভোর হইয়া বিগতপ্রায় পরিচিত কালকে উপেক্ষা করিয়া, আগন্তুক নিদ্রাকে সখী জ্ঞানে সস্নেহে আলিঙ্গন করিল। মূঢ় মানব কুহকিনীর মোহে মুগ্ধ হইয়া অচেতন হইল। অন্ধকারের গাঢ়তার সঙ্গে সঙ্গে নীরবে মৃদু মন্দ পাদবিক্ষেপে কাল প্রস্থান করিতে লাগিলেন।

বিষম চিন্তাক্লিষ্ট সুরেন্দ্র রুগ্নের ন্যায় ধীরে ধীরে আসিয়া একখানি কোচের উপরি অর্দ্ধশায়িত ভাবে উপবেশন করিলেন। ক্ষণপরে দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"যদি আবার কখনও সেই সারল্যের প্রতিমা, স্নেহের পুত্তলিকা হৃদয়ে ধারণ

করিতে পাই, তাহা হইলে কোন দিন হয় ত ইহজীবনে সুখের অধিকারী হইলেও হইতে পারিব।” এই কথা বলিয়া উন্মাদের ন্যায় সুরেন্দ্র একটু হাসিয়া ফেলিলেন। আপন মনে কহিলেন,—“ভ্রান্ত মানব সংসারমরুভূমে মৃগতৃষ্ণিকার ন্যায় এই রূপেই ভাবী সুখকে অন্বেষণ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান স্থান ও সময় ত্যাগ করিয়া নিরন্তর ভবিষ্যৎ স্থানের মধ্যে সুখের কাল্পনিক ছায়ামূর্ত্তি কল্পনাচক্ষে দেখিয়া তাহার পিছু পিছু ছুটিতে থাকে। অশান্তির ক্রীতদাস মানব এইরূপে আপন জালে জড়াইয়া হাতের ধন পাএ ঠেলিয়া মুগ্ধ আশ্বাসে ছুটিতে থাকে। এ ছুটাছুটির বিরাম কোথা?”

এই বলিয়া সুরেন্দ্র নীরব হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। আবার একটু পরে অতি কাতর স্বরে বাণবিদ্ধ মৃগের ন্যায় ব্যথিত হইয়া কহিতে লাগিলেন,—“যে প্রতিমা বিসর্জ্জন দিয়াছি, তাহাকে পুনঃপ্রাপ্তির আশা আর কোথা? আর যদি তাহাকে পাই, তাহা হইলেও যে সুখী হইব, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথা? রোগ কি অবস্থা হইতে মনকে আক্রমণ করে? অথবা মনে উৎপন্ন হইয়া বাহ্য অবস্থায় আরোপিত হয়?” এই কথার সঙ্গে রামতারণ বাবু গৃহে প্রবেশ করিলেন। রামতারণ সুরেন্দ্রের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—“দেখ ভাই সুরেন্দ্র, রসিকতা সংসারে সকল সময়ে, সকল অবস্থাতেই চলে; কেবল প্রেমের ঝোঁকায় চলে না।” রামতারণের এই অপ্রাসঙ্গিক কথা এবং তাঁহার বর্ত্তমান বেশভূষা দেখিয়া সুরেন্দ্র হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। হো হো হো করিয়া উচ্চ হাস্যের তরঙ্গ ছুটাইলেন। বিষাদকূপে নিমগ্ন, হৃদয়ের সুহৃৎ

সুরেন্দ্রের মুখে হাসি দেখিয়া রামতারণ বাবু আন্তরিক সন্তুষ্ট হইলেন।

আজি রামতারণ বাবু একটু অদ্ভুত রকমের নূতন সাজে সজ্জিত। রামতারণ বাবু গঞ্জিফ্রকের পিরিহাণে স্বীয় দীর্ঘ বপু আবৃত করিয়া তদুপরে নিম্নদেশে অসম্ভব প্রকারের ঘের বিশিষ্ট একটি ইজার পরিধান করিয়াছেন। শীত নিবারণো-যোগী এক বাউল বিনিন্দিত টুপি দ্বারা শিরোভাগ আবৃত করিয়াছেন। গলদেশে রামধনুর অনুকরণে নানা রঙের এক কম্‌-ফর্টার জড়াইয়াছেন। এইরূপ বেশভূষায় সুসজ্জিত হইয়া বাম হস্তে এক ফরশি ধরিয়া বাঁধা-বটতলার তাম্রকূটের ধূমে পার্শ্বস্থ বায়ুরাশি গুল্‌জার করিতে করিতে রামতারণ বাবু সুরেন্দ্রমোহ-নের নিকট সমাগত। এই বেশ দেখিয়াই সুরেন্দ্র হাসিয়া ফেলিয়াছিলেন।

রামতারণের মস্তিষ্কে যে, কিঞ্চিৎ দোষ ঘটিয়াছিল, সে পরি-চয় পাঠক পূর্ব্বেই পাইয়াছেন; সুতরাং, রামতারণ বাবুর বর্ত্ত-মান বেশভূষার নিমিত্ত এখন বোধ হয় আর বিশেষ কোন কৈফিয়তের প্রয়োজন নাই।

রামতারণের পূর্ব্বোক্ত কথায় সুরেন্দ্রমোহন একটু গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—"রামতারণ বাবু, যথার্থ বটে; আপনি যাহা বলিয়াছেন তাহা বড় ফেলিবার কথা নহে। বাস্তবিকই প্রেমের ধোঁকায় পড়িলে, মানুষের রস কস্‌ কিছুই থাকে না। সকলই নিমিষে উপিয়া যায়।"

রামতারণ। তাহা বুঝিয়াছ কি?

সুরেন্দ্র। রামতারণ বাবু, লোকে চলিত কথায় বলিয়া

থাকে শিক্ষা দুই প্রকার,—এক ঠেকিয়া শিক্ষা, আর এক দেখিয়া শিক্ষা; তা আমার ভাগ্যে দুইই ঘটিয়াছে। সুতরাং, শিক্ষা সম্পূর্ণই হইয়াছে বলিতে হইবে।

রাম। তাহা হইলে, এতদিনে তোমার চৈতন্ত উদয় হইয়াছে অবশ্য বলিতে হইবে।

সুরেন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ, যথেষ্ট।

রাম। তবে এক্ষণে আত্মসম্বরণ চেষ্টা করিলেই ত ভাল হয়।

সুরেন্দ্র। মানুষ নিজের চেষ্টায় কিছুই করিতে পারে না; মানব ঘটনাচক্রের ক্রীড়াপুত্তল মাত্র। এই ত আমার দর্শন, আর এই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

রাম। যাউক, সে সকল কথা এখন; সে অনেক তর্কের কথা। এখন একটা মোটা কথা বলি শুন,—তোমার চাইতে আমি বয়সে অনেক বড়। এক সময়ে তোমাপেক্ষা অনেক রকমের পাগ্লামীও করিয়াছি; দেখিয়া, ঠেকিয়া শিক্ষা লাভও বিস্তর করিয়াছি। ভাই হে! পুস্তকে কিছুই নাই।

এই বলিয়া রামতারণ অনেক ক্ষণ ধরিয়া আপনার বাল্য-জীবনী, পরে কৈশোর জীবনী তৎপরে যৌবন জীবনী সমাধা করিলেন। ভাবের ভাবুক সুরেন্দ্র, সে সকল কাহিনী অতি আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বিগত জীবনের কাহিনীকলাপ শেষ করিয়া রাম তারণ কহিলেন,—"ভাই সুরেন্দ্র, এ জীবনে অনেক ধাক্কা খাইয়াছি। শেষে এই স্থির করিয়াছি যে, যদি সুখী কেহ হইতে চায়, তবে তাহাকে প্রেমের ব্যবসায়ী হইতে হইবে,

তাহাকে প্রেম দিতে হইবে ; আবার পরিবর্ত্তনে প্রেমের অংশীও হইতে হইবে। এই প্রেমের ব্যবসায়, প্রেমের বিনিময় ব্যতীত দুনিয়ায় আর কিছুতেই আত্মার অভাব মিটাইতে পারে না, আর কিছুতেই মানুষের আত্মা চরিতার্থ হয় না, আত্মার প্রকৃত সুখ আর কিছুতেই জন্মে না। ধন, জন, মান, পদ, ক্ষমতা, যশ আর যাহা কিছু বল ভাই রে! এই ভালবাসা ব্যতীত সকলই অসার সংসারের ফাঁকা ছায়া মাত্র।"

এই কথা বলিয়া রামতারণ গম্ভীরভাবে নীরবে রহিলেন। সুরেন্দ্র মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় ক্ষণকাল আত্মহারা ভাবে স্থির থাকিয়া হৃদয়ের উদ্বেগে কহিলেন,—"ভাল রামতারণ বাবু, বলুন ত, ভাল কথা কি কেহ শিক্ষা দিতে পারে? তাহাতে কি গুরু উপদেশের অপেক্ষা আছে?"

রাম। গুরু উপদেশ, শিক্ষার্থীর পক্ষে সকল বিষয়েই সকল কার্য্যেই আবশ্যক।

সুরেন্দ্র। সে গুরু এ সংসারে কে?

রাম। সুরেন্দ্র, তাহাও কি তুমি এত দিনে বুঝ নাই যে, মহাগুরু গৃহ পরিবার ব্যতীত এ সংসারে আর কে হইতে পারে?

রামতারণের উত্তরে সুরেন্দ্র একটু ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"এ আপনার positivism এর পুরাতন কথা, এ খাঁটি পুস্তকের কথা, কার্য্যকালে ইহাতে কিছুই আসিয়া যায় না।" রামতারণ একটু অপ্রস্তুত হইলেন। মনে মনে ভাবিলেন, "কথাটা পচাই বটে।"

সুরেন্দ্র আবার প্রশ্ন করিলেন,—"রামতারণ বাবু, এ দেশে

কি এখন বিকৃতমস্তিষ্ক পাশ্চাত্য ধাঁধাঁয় বিমোহিত যুবকগণকে উপদেশ দিবার উপযুক্ত গুরু আছেন,বলিতে পারেন কি ?" রামতারণ বাবু প্রশ্ন শুনিয়া একটু অবাক্ হইলেন। মস্তকে হস্ত স্পর্শ করিতে করিতে কহিলেন,—"প্রশ্নটা নিতান্ত ছোটখাট নহে; একটু ভাবিয়া না দেখিলে, ঠিক্ উত্তর দিতে পারিতেছি না।

সুরেন্দ্র হা হা করিয়া উচ্চ হাস্যে কহিলেন—"তবে মাথায় একটু লেভেণ্ডার মস্তকে একটু অডিকলন দিয়ে ভাবিতে বসুন। জিওমেট্রির ১২ বুকের সাহায্যেও বোধ হয় এর মীমাংসা হইয়া উঠিবে না।" এই বলিয়া সুরেন্দ্রমোহন হাসির তরঙ্গ ছুটাইয়া দিলেন।

সুরেন্দ্রমোহনের উচ্চ হাসি ও ব্যঙ্গ দেখিয়া রামতারণ আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। একে মলিন বদন বিষণ্ণ হৃদয় বন্ধুর মুখে হাস্যতরঙ্গ, তাহার উপর আবার তাঁহার নিজের কথায়। রামতারণের আনন্দের সীমা রহিল না। কেনই বা রহিবে? রামতারণের হাস্য ত আর তোষামোদিগণের দেঁতোর হাসি নয়, অথবা খেলো কথার উপর পাশ্চাত্য শিষ্টাচার অনুমোদিত মুচ্‌কি কাষ্ঠ হাসিও নয়। রামতারণের অকৃত্রিম আনন্দময় হাস্যের তবে সীমা রহিবে কেন?

রামতারণ বাবু হাস্য বেগ সম্বরণ করিয়া কহিলেন,—"একটু অপেক্ষা কর। আমি হাতে কলমে তোমার গুরু জুটাইয়া দেওয়াইব।

সুরেন্দ্র। কিসের গুরু জুটাইবেন?

রাম। ধর্ম্মের গুরু, আবার গুরু কিসের ভাই; যিনি ধর্ম্মশিক্ষা দেন তিনি সকল বিষয়েই দীক্ষা গুরু।

সুরেন্দ্র এই কথায় একটু গম্ভীরভাবে কহিলেন,—"উত্তম স্থির করিয়াছেন। এত দিনে কি আমার সম্বন্ধে আপনার এই বিশ্বাস ও ধারণা জন্মিয়াছে?"

রাম। কেন, আমার ধারণা ও বিশ্বাস কি তবে ভুল হইয়াছে?

সুরে। বিশ্বাস ভুল হইয়াছে। আমার যে আদৌ ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই, যাহার মুলেই বিশ্বাস নাই, তাহার আবার দীক্ষা কি?

রামতারণ চমৎকৃত ভাবে হৃদয়ের ভাবে কহিলেন,—"হতভাগ্য সুরেন! এই জন্যই তুই জগতে এত অসুখী। স্বর্ণ-অট্টালিকাতেও তোর বসিতে শয্যা নাই।"

সুরেন্দ্র। ব্যঙ্গচ্ছলে কহিলেন,—"চিকিৎসক! আপনাকে আরোগ্য কর।"

রামতারণ পুনরায় হৃদয়ের ভাবে কহিলেন,—"সুরেন, ভাই, এত দিনে আমি আত্মব্যাধি আরোগ্য করিয়াছি। তাই এক্ষণে তোমায় রোগ মুক্ত করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি।"

সুরেন্দ্র দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিলেন,—"এ বড় মন্দ চিকিৎসকের হস্তে পড়ি নাই। রোগ না জানিয়াই ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা।" এই বলিয়া কৌচের উপর শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। রামতারণ পার্শ্বস্থ খাটে শুইয়া পড়িলেন।

নবম পরিচ্ছেদ।
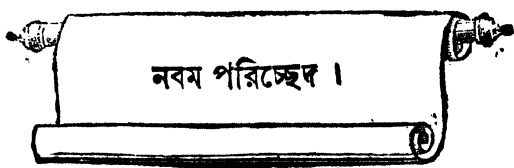
সুরেন্দ্রমোহনের ম্লান ভাব দিন দিন বিষম সাংঘাতিক রোগের স্তায় বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। রামতারণ বাবু ছলে কৌশলে সময়ে অসময়ে কত ভাবে কতই বুঝান, কতই উপদেশ দেন, কিছুতেই সুরেন্দ্রমোহনের মনোমালিন্য দূর হয় না। কোটরগত বহ্নি যেমন লুক্কায়িত ভাবে বনস্পতির ধ্বংস সাধন করে, অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া ঘুণ কীটে যেমন বৃহৎ বৃহৎ শালের গুঁড়ি জর্জ্জরিত করিয়া ফেলে, তেমনি এক বিষম বিষাদ-বিষে সুরেন্দ্রমোহন অন্তরে অন্তরে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন।

এই অবস্থায় একদিন নিরুপমা সুরেন্দ্রমোহনের নিকট আসিয়া মধুর প্রেমভাবে কহিলেন,—"সুরেন, শশী বাবু এখনই আসিবেন; চল না কেন, কয়জনে মিলিয়া আজ ইডেন গার্ডেনের ওধার হইতে বেড়াইয়া আসা যাউক।

নিরুপমাকে দেখিয়া সুরেন্দ্র পূর্ব্বেই অন্তরে বিরক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া সুরেন্দ্রমোহনের আন্তরিক বিরক্তি ক্রোধে পরিণত হইল। সুরেন্দ্রমোহন যদিও যৌব-

নের বয়স দোষ আজিও কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই, কিন্তু স্বাভাবিক শান্তধাতু ও তাহার অনুশীলনের গুণে অনেকটা যৌবনসুলভ উষ্ণ রক্তের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়াছিলেন। নিরুপমার প্রস্তাবে যদিও তিনি আন্তরিক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু অত্যন্ত দমন শক্তির গুণে সে মনের ক্রোধ মনেই গোপন করিয়া ধীর ভাবে কহিলেন,—"নিরুপমা, আমায় আজ একটু মাপ করিতে হইবে, আমি কোথাও যাইব না। তোমরা দুইজনেই বেড়াইয়া আইস।"

ছলনাময়ী নিরুপমা এই কথায় নানা ছাঁদে নানা ফাঁদে সুরেন্দ্রমোহনকে অনেক মিষ্ট কথা বলিল। অবশেষে নিরুপমা স্বীয় গাত্রের অর্দ্ধ গাউন সংস্থিত লেবেণ্ডার সিক্ত রেশমী রুমাল লইয়া মুখ আবৃত করিয়া অশ্রু মোচনের ভাণ করিল। সরল হৃদয় সুরেন্দ্রের বিশ্বাস ও মোহে একটু আঘাত লাগিল।

যাহাদিগকে সূক্ষ্ম কথায় কবি কহে, মোটা কথায় তাহারাই দুনিয়ার ভাবুক লোক। মহামতি অরিষ্টটলের কথার অনুসরণ করিয়া আমরাও বলি যে, এই ভাবুক শ্রেণীর লোক সাধারণতঃ বড় অমায়িক, সরল অথবা ভিন্ন কথায় একটু বোকাটে বলিলেও বোধ হয় বিশেষ হানি নাই; কারণ, ইহাঁরা প্রায়ই একটু সাধারণ-বোধি বিবর্জ্জিত হইয়া থাকেন।

সরল হৃদয় বা সাধারণ-বোধ-বিবর্জ্জিত সুরেন্দ্রমোহন নিরুপমার প্রেম আলাপনে একটু বিগলিত হইয়া কহিলেন,—"নিরুপমে, আমি বুঝি—আমি ভাণ করিতে জানি না। আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি যে, আমি তোমার অযোগ্য অকৃতজ্ঞ পতি।" এই বলিয়া সুরেন্দ্রমোহন অশ্রু মোচন করিতে করিতে

কহিলেন,—"নিরুপমা, আমায় ক্ষমা কর, আমায় বিদায় দাও। আমি কিছুকাল পশ্চিম বেড়াইতে ইচ্ছা করিয়াছি; আমার মন কিছুতেই শান্ত হইতেছে না। দেশ পরিবর্ত্তনে মানসিক শান্তি লাভ করিতে পারিব কি না, তাহাই একবার দেখিব মনস্থ করিয়াছি।"

নিরুপমা আম্‌তা আম্‌তা করিয়া অর্দ্ধ ভঙ্গ স্বরে কহিল,—"কি জান ভাই, শান্তি, মনে সুখ না জন্মিলে, তুমি কাশী যাও আর মক্কা যাও, কোথাও তাহা পাইবে না।"

কথাটা সুরেন্দ্রের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিল। সুরেন্দ্র কহিলেন,—"নিরুপমে, কথাটি যাহা বলিলে, বড়ই সত্য; কিন্তু কি যে করি, বুঝিয়াও বুঝিতেছি না—প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, এখানে আর একদণ্ডও থাকিতে ইচ্ছা হইতেছে না।"

নিরুপমা পুনরায় কুহকের কথায় কহিল,—"তবে আর কি বলিব। যদি নিতান্তই মনটা বড় খারাপ হইয়া থাকে, তবে রামতারণ বাবুকে সঙ্গে লইয়া দশ পনর দিবসের জন্য একবার ঘুরিয়া আইস। এ দিকে আমি শশী বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া বিষয় আশয় গুলির বন্দোবস্ত করিয়া রাখিব।"

সুরেন্দ্রমোহন অন্তরে একটু হাসিয়া কহিলেন,—"সেই উত্তম প্রস্তাব। তুমি শশী বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া বিষয় আশয়ের ভালরূপ বন্দোবস্ত করিয়া রাখ। আপাততঃ আমি একটু বাহির হইতে ঘুরিয়া আসি। এই নাও, বাক্সের চাবিগুলা রাখ।" এই বলিয়া নিরুপমার হস্তে চাবির গোছা প্রদান করিয়া বেগে সুরেন্দ্রমোহন প্রস্থান করিলেন। চাবির তোড়া হস্তে পাইয়া নিরুপমা মনে মনে আনন্দে গলিয়া যাইল।

নিকটস্থ একখানি চেয়ারে উপবেশন করিয়া নানা ভাবের মৎলব ফাঁদিতে লাগিল।

নিরুপমা এইরূপে ভাবের আবর্ত্তে পড়িয়া হাবু ডুবু খাইতেছে, এমন সময়ে, তাহার প্রেমকাণ্ডারী শশী বাবু তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কুহকিনী নিরুপমা তাহার প্রেমপতঙ্গ শশীবাবুর জন্য ললনাসুলভ প্রেম-ক্রন্দনের ফাঁদ পাতিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। শশিভূষণ কৃত্রিম ব্যগ্রতা দেখাইয়া কহিল,—"আজ মুখ মলিন কেন নিরু? পূর্ণিমায় অমাবস্যা! কোন রকম অসুখ বিসুখ হয় নি ত?"

নিরুপমা নানাবিধ আড়ম্বরের মুখবন্ধ করিয়া কহিল,— "আমাদের মত হতভাগিনীদের কি আর অসুখ আছে? মৃত্যু আমাদের দেখে চক্ষু মুদ্রিত করে যে!"

কথা শুনিয়া শশী বুঝিল ব্যাপার নিতান্ত সামান্য নহে। কাণ্ড কিছু গুরুতর, দাঁড়াইয়াছে বুঝিয়া দ্বিগুণতর ব্যাকুলতা ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করিয়া কহিল,—"নিরু, তুমি সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, প্রেম প্রীতির আকর বিশেষ; তোমার মনঃপীড়া অবশ্য কখনও সামান্য কারণে হয় নাই।" এই বলিয়াই শশী ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া হঠাৎ নিরুপমার হস্তদ্বয় ধরিয়া ফেলিল। কহিল,—"নিরুপমে, এই সংসার-মরুভূমে তুমিই আমার শান্তি-নিকেতন, তুমিই আমার হৃদয়-আকাশের শারদ-শশী। তুমি মেঘাচ্ছন্ন থাকিলে, আমার পক্ষে যে সমুদয় জগৎই আধারময়। দেখ নিরুপমে, (ক্রন্দনের স্বরে) ইহলোকে আমার আর কেহই নাই। পরলোকেও কল্পনার দূরবীক্ষণে

একমাত্র তোমারই মুখচ্ছবি ব্যতীত আর কিছুই ত দেখিতে পাই নাই।" এই কথা বলিতে বলিতে শশিভূষণের স্বরভঙ্গ হইল; শশিভূষণ আর কথা কহিতে পারিলেন না। শশিভূষণের অশ্রুজলে নিরুপমার হৃদয় দ্রবীভূত হইল।

নিরুপমে তুমি তুচ্ছ অবলা-সমাজের চাতুরালী শিখিয়াছ বই ত নয়? শশিভূষণ যে সংসার-পোড়ে উত্তীর্ণ—প্রেমের হাটের পাকা পাইকের। তাহার মর্ম্মভেদ করা তোমার মত রমণী-বুদ্ধির কার্য্য নহে।

নিরুপমা অন্তরের সহিত কহিল,—"শশিভূষণ, তুমি জান যে, কায়মনঃপ্রাণ তোমাকেই সমর্পণ করিয়াছি। তোমারই চালনায় আমার মনঃপ্রাণের ছায়ামাত্র সুরেন্দ্রমোহনকে দিয়া রাখিয়াছি।"

শশিভূষণ কহিল,—"নিরুপমে, তাহাও কি আবার আমাকে তুমি মুখে বলিয়া বুঝাইবে? সে কথা ত আমার অন্তরের অন্তস্তলে জাগরূক রহিয়াছে; কিন্তু আজ তুমি এ সকল কথা নূতন করিয়া কেন বলিতেছ?"

বহুরূপধারী শশিভূষণ নানারূপ বদ্‌লাইয়া ফেলিল। হা হা হা করিয়া উচ্চ হাস্যের তরঙ্গ ছুটাইয়া কহিল,—"এই কথা! এর জন্য তোমার এত চিন্তা—এত দুঃখ! আমি বলি, না জানি ব্যাপার কি সাংঘাতিক। নিরুপমে, তোমার ন্যায় সুশিক্ষিতা বুদ্ধিমতী রমণীর হৃদয়েও দৌর্ব্বল্য কুসংস্কার আশ্রয় পায়?"

নিরুপমা শশিভূষণের কথায় একটু বিরক্ত হইয়া কহিল,—"শশিভূষণ, আমায় ক্ষমা কর। যদি এ ভাব আমার

কুসংস্কার বা দৌর্ব্বল্য হয়, তবুও ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যেন কখনও এ সকল যেন আমার মন হইতে দূরীভূত না হয়।" শশি, বল দেখি, নিজের হৃদয়ে হস্ত দিয়া বল দেখি, পাপের প্রতি ঘৃণা কি কুসংস্কার? তোমার এ ধারণাকে ত ভয়ঙ্কর বলিতে হইবে। কেন তুমিই ত কত শত লোককে কত দিন নীতি, বিবেক, ধর্ম্ম প্রভৃতির ব্যাখ্যা করিয়া কত রূপ উপদেশ প্রদান করিয়া থাক। আজি কি তোমার হঠাৎ মত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? অথবা সে সকল তোমার ঈশ্বরের প্রতি কপট পরিহাস?" কথাগুলি নিরুপমা উন্মাদের ন্যায় বিকট চীৎকারে উচ্চারণ করিয়া কহিল। শশিভূষণ নিরুপমার মুখে রুমাল চাপিয়া কহিল,—"নিরু, তুমি কি পাগল হইলে? চুপ কর, চুপ কর। দেখ, বড় সর্ব্বনাশের কথা। সাবধান! তুমি ত নিতান্ত সামান্য রমণী নও নিরুপমে! তুমি সুশিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী রমণী, তুমি এই উনবিংশ শতাব্দীর এক আদর্শ রমণী। তোমার হৃদয়ে এরূপ অনুদারতা, এত চাঞ্চল্য, এ যে বড় লজ্জার কথা।"

জগতে যত প্রকার চাতুরালী আছে, তন্মধ্যে তোষামোদকেই রাজনৈতিক ও দার্শনিক সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়া থাকেন। যুক্তি ইহার সহিত ওজনে বিস্তর হাল্কা হইয়া পড়ে। এই তোষামোদ স্বকার্য্য সাধনের জন্য ধূর্ত্তজনের পক্ষে ব্রহ্মাস্ত্র বিশেষ। শশী বাবুর ব্রহ্মাস্ত্র নিরর্থক হইল না,—নিরুপমার সরল কোমল হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিল। নিরুপমা পরিতুষ্ট হইয়া কহিল,—"শশি, আমি ফাঁকা তর্কের বিচার করিতেছিলাম মাত্র।

কার্য্য কালে আমার মতের সহিত তোমার মতের ঠিক্ মিল আছে।"

শশিভূষণ মুখ টিপিয়া একটু হাসিল। হাসিয়া কহিল,—"নিরু, আমার লম্ফ ঝম্ফ তোমারই প্রেম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আমি অশ্ব, তুমি বল্গা। তুমি যেমন চালাইবে, আমাকে তেমনই চলিতে হইবে।

প্রজ্বলিত হুতাশনে ঘৃতাহুতি পড়িল। অল্প শিক্ষার বিদ্যাভাণগ্রস্ত নিরুপমার তমঃ—হুতাশনে প্রসংশাবাদের আহুতি পড়িল। নিরুপমা আহ্লাদে বিগলিত হইয়া কহিল,—"দেখ, এখন একটা কথা বলি, একটু স্থির হইয়া শুন। সুরেনের যেরূপ মনের অবস্থা, তাহাতে বোধ হয় যে, তিনি অল্প দিনেই উন্মাদ হইয়া যাইবে। তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে।"

নিরুপমার কথা সমাপ্ত না হইতেই শশিভূষণ কহিল,—"উন্মাদই হউক আর আর যাহাই হউক, আপন কার্য্য ভুলিবার পাত্র তাহারা নহে। কখনও কি তাহার কোনও কার্য্যের মূলে ভুল পাইয়াছ? কোনও দিন তোমার হস্তে এ পর্য্যন্ত তাহার চেষ্টের চাবি পেয়েছ?"

নিরুপমা আনন্দে কহিল,—"শশি, সুচিকিৎসকের ঔষধ কি নিষ্ফল হয় কখন? এই দেখ!" এই বলিয়া চাবির গোছা শশিভূষণকে দেখাইল।

শশিভূষণ একটু বিস্মিত ভাবে কহিল,—"এ যে আজি নূতন কাণ্ড দেখিতেছি।"

নিরু। নূতনের এখনও বিস্তর বাকী। আপাততঃ সে

সকল কথার সময় নহে। এক্ষণে আইস, এই সুযোগে টাকা কড়ি গুলি সরাইয়া ফেলা যাউক।

শশী। সে ত ১০ মিনিটের কার্য্য। এক্ষণে কথা হইতেছে, মূলে হাবাৎ করিতে হইবে, জড় মারিতে হইবে।

নিরু। তাহার অর্থ কি?

শশী। বুঝিলে না? তবে বলিতেছি।

শশিভূষণ বাহিরে আসিল। বাটীর চারি পার্শ্বে ঘুরিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। বাহিরের সমস্ত দ্বার জানালা বন্ধ করিয়া শশিভূষণ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। কহিল,—"নিরু, বলিতেছিলাম কি, এক কার্য্য করিলে হয় না?"

নিরু। কি?

শশিভূষণ নিরুপমার কাণে কাণে কি কহিল। নিরুপমা চমকাইয়া উঠিল। উচ্চৈঃস্বরে কহিল,—"শশি, দুয়ার খুলিয়া দাও, আমার হাঁফ লাগিতেছে।"

শশী। ভয় পাইলে? সাহস না হইলে কোন মহৎ কার্য্য জগতে সুসিদ্ধ হয় না।

নিরুপমা সতেজে কহিল,—"সাহসে ধিক্! কার্য্য-সাধনে ধিক! বিষ খাওয়াইয়া একটি নির্দ্দোষ ব্যক্তির জীবন বিনষ্ট করা আমা হইতে হইবে না।"

শশী। ভয় পাইতেছ কেন? তোমাকে বেশী কিছুই করিতে হইবে না।

নিরুপমা শশিভূষণের কথায় বাধা দিয়া কহিল,—"শশি, যে কার্য্য তোমার কথায় করিয়া ফেলিয়াছি, তাহাতে আর হস্ত নাই, কিন্তু এ টুকু তুমি মনে জানিও যে,

নিতান্ত নীচ চণ্ডালের গৃহে আমার জন্ম হয় নাই। আমি নিজে অবশ্য অতি অধম; কিন্তু আমার জন্ম যে এক মহৎ কুলে তাহা কি তুমি জান না। তুমি কি এই সকল জঘন্য কার্য্য সাধনের নিমিত্তই আমায় গৃহ হইতে বাহির করিয়াছিলে?"

দুষ্ট শশিভূষণ দেখিল, নিরুপমা কিছুতেই তাহার প্রয়োজনেরমত হইল না। তখন এক বিকট হাসি হাসিয়া কহিল,—"নিরুপমে, আমি কেবল তোমার হৃদয় পরীক্ষার নিমিত্ত, প্রস্তাব করিতেছিলাম মাত্র। সত্যই কি কার্য্যে তাহা ঘটিত? এখন চল, সত্বর টাকা কড়ি গুলা সরাইয়া ফেলা যাউক। আর বিষয় আশয়ের যে সকল দলিল পত্র আছে, সে সকল স্থানান্তরিত করিয়া একটা জাল দলিলের যোগাড় যন্ত্র করা যাউক।" এই বলিয়া শশিভূষণ উঠিয়া দাঁড়াইল। নিরুপমার হস্ত হইতে চাবির গোছা লইয়া অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। নিরুপমা কথাবার্ত্তা না কহিয়া শশিভূষণের পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিল।

বাহির হইতে একজন কহিল,—"শশীবাবু! এত দূর বাড়াবাড়ি বড় ভাল নহে। একজন উপরওয়ালা ত মাথারউপর রহিয়াছেন।"

শশিভূষণ নীরবে কাষ্ঠপুত্তলের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। নিরুপমা বিঘূর্ণিত মস্তকে মৃত্তিকায় বসিয়া পড়িল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বলাইএর কুশী গ্রামে আসিবার পর সপ্তম মাস অতীত হইয়া অষ্টম মাসের প্রথম দিবস আজি পড়িয়াছে। বলাই বড় বিরক্ত হইয়া নীরবে বৃদ্ধার ছায়ায় বসিয়া মধ্যে মধ্যে কট মট চক্ষে সূর্য্য দেবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন।

একটু পরে শারদাকাশে নবীন জলদখণ্ডের ন্যায় গম্ভীর গতিতে কুণ্ডলা মহাভারত হস্তে বলাইএর সম্মুখে উপবেশন করিল। পাঠক, আপনি কয়েক মাস পূর্ব্বে যে কুণ্ডলাকে দেখিয়াছেন, বৃদ্ধার আদুরে সন্তান কুণ্ডলা আজি আর সে কুণ্ডলা নাই। বালিকা কুণ্ডলা আজি প্রৌঢ়ার ন্যায় গম্ভীর স্রোতস্বতী সাগর সঙ্গমে বিলীন হইয়াছে।

কুণ্ডলা ধীরভাবে বলাইএর চরণ বন্দনা করিয়া মহাভারত খুলিল। বলাই পাঠ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল পাঠ জিজ্ঞাসা করিয়া বলাই কুণ্ডলাকে নূতন পাঠ প্রদান করিলেন। কুণ্ডলা নূতন পাঠ আবৃত্তি করিতে

করিতে কহিল,—"মহাভারত খানি আমাকে আর কতবার পড়িতে হইবে ?"

বলাই উত্তর করিলেন,—"এখনও চারিবার ; কিন্তু আমার কাছে আর একবারের অধিক নহে।"

কুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিল,—"তাহার পরে কাহার নিকট ?"

বলাই। তাহা গুরুদেব জানেন।

কুণ্ডলা। তবে এবারে আমার যে কয় স্থানে বিশেষ সন্দেহ আছে, সে কয় স্থানে আপনার নিকট হইতে ভাল করিয়া বুঝিয়া লইব।

বলাই। এখনই বল, কি কি কথা তোমারে জিজ্ঞাস্য আছে ?

কুণ্ডলা। প্রথম জিজ্ঞাস্য, মহাভারতে শিক্ষণীয় বিষয় কি কি ?

বলাই। সকলই ;—মহাভারতের সকলই শিক্ষণীয়। গৃহ-কর্ম্ম, সমাজধর্ম্ম, রাজনীতি অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান, এক মহাভারত অধ্যাপিত হইলে এ সকলই অধ্যয়ন করা হয়।

কুণ্ডলা। কই, আমার ত তবে কিছুই শিক্ষা বা অধ্যয়ন করা হয় নাই বলিতে হইবে। আমি দেখিতেছি, আমি পূর্ব্বেও যেমন অনভিজ্ঞ ছিলাম, এখনও ঠিক্ সেইরূপই আছি।

বলাই হাসিয়া কহিলেন,—"কুণ্ডলা, মহাভারত অধ্যয়ন এ দেশে কয় জনের ভাগ্যে ঘটিতেছে ; তুমি ত অতি সরল-মতি অল্পবয়স্ক বালিকামাত্র, তোমার কথা ত বহুদূরের কথা। তুমি ত এ পর্য্যন্ত মহাভারতের ঐতিহাসিক ভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ মাত্র।"

কুণ্ডলা। তবে মহাভারত অধ্যয়ন আমার কিরূপে হইবে?

বলাই। গুরুদেব স্বয়ং তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করিবেন বোধ হয়।

কুণ্ডলা। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হই-তেছে; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিতে আবার মনে বড় ভয়ও হইতেছে।

বলাই। ভয়ের কোনই কারণ নাই; যে কোন বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইবে, স্বচ্ছন্দে তাহার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা বাদ দ্বারা তাহা বুঝিয়া লইতে চেষ্টা করিবে।

কুণ্ডলা। জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, মহাভারতে যত কথা বর্ণিত হইয়াছে, সে সকলই কি সত্য?

বলাইএর হৃদয় আকুলিত হইয়া উঠিল। বলাই কি উত্তর দিবেন, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। এমন সময় গুরুদেব আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বলাই ও কুণ্ডলা উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিলেন। গুরুদেব উপবেশন করিয়া কহিলেন,—"বলাই, তোমাদের কার্য্য কর, আমার জন্য ব্যস্ত হইতে হইবে না।" বলাই আরও আকুলিত এবং উৎকণ্ঠিত হইলেন। বলাই একটু অপ্রতিভ ভাবে কহিলেন,—"কুণ্ডলা একটি বড় কঠিন প্রশ্ন করিয়াছে।"

গুরুদেব। কি প্রশ্ন?

বলাই। কুণ্ডলা জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, মহাভারতে যত বিষয় ও ঘটনা বর্ণিত আছে, সকলই কি সত্য?

গুরু। তুমি তাহাতে কি উত্তর দিয়াছ?

বলাই। আমি কোন উত্তর দিতে পারি নাই।

গুরু। কেন?

বলাই। আমি নিজে আজিও সে সম্বন্ধে কিছুই মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি নাই।

গুরুদেব ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন,—"তবে কি তোমার মহাভারতে আস্থা নাই?"

বলাই। ভক্তি ও আস্থা যথেষ্ট আছে।

গুরু। যাহাতে দৃঢ় বিশ্বাস নাই, তাহাতে কি ভক্তি ও আস্থা জন্মিতে পারে?

বলাই এ কথার কিছুই উত্তর করিয়া উঠিতে না পারিয়া নীরবে অধোবদন হইয়া রহিলেন। বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরুদেব বলাই ও কুণ্ডলাকে প্রকোষ্ঠান্তরে গমন করিতে আদেশ করিলেন। বলাই ও কুণ্ডলা প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধা আসিয়া গলবস্ত্র হইয়া গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। গুরুদেব হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন।

বৃদ্ধা গম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"ঠাকুর, কুণ্ডলার উপায় কি করিলেন?"

গুরুদেব কহিলেন,—"কুণ্ডলাকে রাজরাণী করিব।"

বৃদ্ধা অবাক্ হইলেন। বৃদ্ধার দৃঢ় বিশ্বাস যে পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইলেও গুরুদেবের মুখনিঃসৃত বাক্য কখনই টলিবে না; তাই, বৃদ্ধা গুরুদেবের কথা শুনিয়া অবাক্ হইলেন।

যে আপন কথায় লোকের মনে এইরূপ একটা বিশ্বাস বা ধারণা জন্মাইয়া দিতে পারে, সেই ত জগতে বীর। শত কামানের গোলা হইতে এই বীরবাক্যের শক্তি অধিক।

বৃদ্ধা কাঁদিয়া কহিলেন,—"হতভাগিনী কুণ্ডলা কি একাকিনী রাজসিংহাসনে উপবেশন করিবে?

গুরুদেব একটু হাসিয়া কহিলেন,—"সে জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না। কুণ্ডলার সাথী মিলাইতে যত্নের ক্রটি হইবে না। ভাগ্যপ্রসন্ন থাকিলে অবশ্য কুণ্ডলা অনায়াসেই মনোমত সাথীর সহিত সম্মিলিতা হইয়া রাজ্যভোগ করিবে।" বৃদ্ধা নীরবে অধোবদনে রহিলেন। গুরুদেব জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভাল জিজ্ঞাসা করি, সুরেন্দ্রমোহনের তথ্য কোথায় বিশেষ রূপে পাইবার সম্ভব, বলিতে পার কি?" দিদি মা কহিলেন,—"ইদানীং তাহার বিশেষ কথা ত কিছুই বলিতে পারি না; তবে বহু দিন হইল একবার শুনিয়াছিলাম, বিভিন্ন ধর্ম্মীর সহবাসে কলিকাতায় বাস করিতেছিল।"

গুরুদেব উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"অদ্য আমি চলিলাম। দেখিও, কুণ্ডলার অধ্যয়নের যেন কোনরূপ ক্রটি না হয়। মহা-ভারত সমাধা হইলে, এই পুস্তকখানি তাহাকে পড়িতে হইবে।" এই বলিয়া তালপত্রে লিখিত এক খণ্ড পুঁথি বৃদ্ধার হস্তে প্রদান করিয়া গুরুদেব বর্ষীয়ান্ মাতঙ্গের ন্যায় স্থির গম্ভীর পদবিক্ষেপে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। বৃদ্ধা দ্বার পর্য্যন্ত তাঁহার অনুগমন করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।
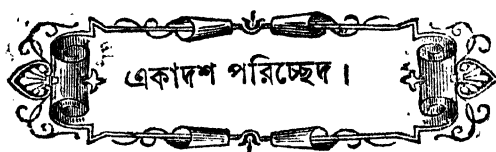
এই সংসার একটি মহাবৃক্ষ স্বরূপ। তাহার আশে পাশের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় প্রশাখায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ফল ফলিতেছে। তন্মধ্যে কোন শাখার ফল কষায়, কোন শাখার ফল তিক্ত, আবার কাহারও ফল বড়ই কটু বোধ হয়। এ সকল ছাড়িয়া অগ্রভাগের শাখায় লক্ষ্য করিলে, বড়ই সুস্বাদু ফল ভাগ্যে মিলিয়া যায়।

মানব এই সংসার-বৃক্ষে ক্ষুদ্র পিপীলিকা মাত্র। যে মানব-পিপীলিকা সংসার-বৃক্ষের অগ্র শাখায় উঠিতে সমর্থ হয়, তাহারই ভাগ্যে ঐ সুস্বাদু ফল মিলিয়া যায়। আর তাহা ছাড়িয়া যাহারা আশে পাশের ডালে ঘুরিতে থাকে, তাহাদিগকে তিক্ত, কষায় ফলের আস্বাদন করিয়াই দুর্ব্বিষহ দুঃখে জীবন কাটাইয়া দিতে হয়।

বলাই সংসার-বৃক্ষের এই অগ্র শাখাস্থিত অমৃত ফললাভের জন্য বিশেষ উৎসুক। বলাই সেই ফললাভের আশয়ে প্রাণপণ করিতে-ছেন; কিন্তু আজিও সে ফললাভ বলাইএর ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না। বলাই একবার উঠিতেছেন, একবার পড়িতেছেন,

আবার কখনও পথভ্রান্ত হইয়া বৃক্ষের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় ঘুরিতেছেন।

বলাইএর এই উত্থান পতন ঘূর্ণন সকলই—সকল মানবের ভাগ্যচক্রে গ্রথিত। মানব যতই নিম্নে পড়ুক বা কেন্দ্রবিন্দু ছাড়িয়া যত পার্শ্বেই ঘুরুক, সে কখনই অগ্র শাখার এই লক্ষ্য হইতে একবারে বিচ্যুত হয় না। আর যে দিন সে একেবারে এই লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়, সে দিন জগৎ তাহার নিকট প্রেতের বিকট হাস্যময় দগ্ধ শ্মশানে পরিণত হয়, আর তাহার মনুষ্যত্ব ঘুচিয়া পশুত্ব জন্মে।

বলাইএর অন্তর্জগতে আজি উত্থান পতনের মহা সংগ্রাম উপস্থিত। গুরুদেবের বৃদ্ধা ভবন হইতে শেষ গমনের পর আজি এক পক্ষ অতিবাহিত হইয়াছে। বলাই অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বাহিরে আসিল। ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—"এ জন্মে ভগবান্ আমার ভাগ্যে উত্থান লিখেন নাই; এ জন্মে পতিতই রহিলাম।" এই বলিয়া বলাই উন্মাদের ন্যায় উদ্ভ্রান্ত চিত্তে বাটীর বাহির হইল। বাহিরে আসিয়া গুরুদেবের আশ্রম পথ ধরিল।

দুই ক্রোশ পথ চলিয়া বলাই দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অরণ্য-মধ্যগত আশ্রমাভিমুখী পথে প্রবেশ করিল। কিছু দূর আসিয়া সেই পথ ছাড়িয়া বলাই এক অতি সঙ্কীর্ণ শুঁড়ি পথ ধরিল। এই পথে কিছু দূর আসিয়া বলাই এক ভগ্ন মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিল। বলাই তথায় ধ্যানমগ্না যোগিনীকে নিরীক্ষণ করিয়া নিস্তব্ধভাবে উপবেশন করিল। দণ্ড দুই পরে যোগিনী নেত্র উন্মীলন করিয়া বলাইকে দেখিলেন। বলাই কাতর-

কণ্ঠে কহিলেন,—"পার্ব্বতি! আমায় ক্ষমা কর। আমি অতি অধম পতিত জীব। আমার উদ্ধারের আর আশা নাই। আমি সংসারে ফিরিতে মনস্থ করিয়াছি। এ পবিত্র পন্থা কলুষিত করিতে আমার আর ইচ্ছা নাই; তাই তোমার নিকট শেষ বিদায় লইতে আসিয়াছি।"

পার্ব্বতী কহিলেন,—"বলাই, মনুষ্যের পদ স্খলন কত বার হয়?"

বলাই কহিলেন,—"যে পূর্ণ মানব তাহার কখনই হয় না। যে অর্দ্ধ মানব তাহার জীবনে দুই একবার—আর যে মানব আকারে পশু তাহার বরাবরই হইয়া থাকে।"

পার্ব্বতী হাসিয়া কহিলেন,—"যে নিজে উঠিতে অক্ষম, সে অপরের উত্থানের পথে বাধা জন্মায় কেন?"

বলাই উন্মাদের ন্যায় হইয়া উঠিলেন, বলাইএর চক্ষু আরক্ত হইল; কলেবর কম্পিত হইতে লাগিল।

পার্ব্বতী বলাইএর হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন,—"বলাই, আমি নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি, তুমিই আমার উত্থানের অন্তরায়। তোমার বাধা অতিক্রম করিয়া উঠিবার সাধ্য আমার নাই; কিন্তু তুমি অর্দ্ধ মনুষ্য—তোমায় বাধা দিবার সাধ্য আমার আর নাই। তোমার উদ্ধার অনিবার্য্য ও অতি নিকট, কিন্তু আমার ত্রাণের আশা আর নাই। তুমি প্রস্থান কর, পিশাচীর সহবাসে আর স্বীয় পবিত্র আত্মাকে কলুষিত করিও না।"

বলাই ভগ্নকণ্ঠে কহিলেন,—"পার্ব্বতি, তুমি পিশাচী নহ—তুমি দেবী! তোমার আশ্রয়-ছায়া ছাড়িলে সংসার-অনলের উত্তাপে পুড়িয়া মরিব।"

পার্শ্ব হইতে গুরুদেব আসিয়া জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন,— "পার্ব্বতি! হতভাগিনি! দূর হ'ও। বৃথাই পাশব শিশু পালন করিয়াছি।"

পার্ব্বতী চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে, গুরুদেব তাহার কেশরাশি ধারণ করিয়া কহিলেন,—"আইস, অগ্রে আশ্রমে যাইয়া পাপের দণ্ড ভোগ কর, পরে প্রস্থান করিও।"

পার্ব্বতী কটিদেশ হইতে তীক্ষ্ণধার ছুরিকা বাহির করিয়া কহিল,—"পিতঃ! আমি পতিতা, নির্ল্লজ্জা, আমার আবার মান অপমান কি? আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি,—এ দেহ, প্রাণ সকলই বলাইকে প্রদান করিয়াছি। বলাই এই দেহের একমাত্র অধিকারী। বলাই ব্যতীত এ দেহে দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা আর কাহারও নাই। এই দেখুন, বলাইএর দেহ— বলাইএর সম্মুখেই ধ্বংস করি।" এই বলিয়া পার্ব্বতী ছুরিকা উত্তোলন করিলেন। গুরুদেব পার্ব্বতীর হস্ত ধারণ করিয়া ছুরিকা কাড়িয়া লইলেন। স্বীয় উত্তরীয় দ্বারা পার্ব্বতীর হস্ত বন্ধন করিয়া কহিলেন,—"বলাই, পশ্চাৎ আইস।" বলাই পশ্চাৎ অনুগমন করিতে লাগিল।

যাইতে যাইতে গুরুদেব বলিলেন,—"পার্ব্বতি, আমারই দেহ হইতে তোর উদ্ভব—আমারই অঙ্গ, তোর নয়।"

গুরুদেব আশ্রমে আসিয়া উপনীত হইলে, কয়েকজন শিষ্য আসিয়া করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিল। তাহারা পার্ব্বতীর হস্তের বন্ধন ও গুরুদেবের বাহ্যিক আকৃতি দেখিয়া ভীত হইল। ভাবিল, বিশেষ গুরুতর ঘটনাই ঘটিয়াছে।

গুরুদেব শিষ্যগণকে আদেশ করিলেন,—"হতভাগিনীকে

এক পক্ষ নির্জ্জন গৃহে সাবধানে বাঁধিয়া রাখ। সকলে একত্রিত হইলে, এক পক্ষ পরে ইহাদের বিচার করিয়া দণ্ড প্রদান করিতে হইবে।"

শিষ্যগণ ভীত মনে ধীরে ধীরে পার্ব্বতীকে লইয়া গেল। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে কেহই সাহস করিল না।

সকলে চলিয়া গেলে গুরুদেব কহিলেন,—"বলাই, তুমি হতাশ হইও না। প্রেমের অধঃপতন, প্রেমময়ের রাজ্যে অসম্ভব। অধ্যবসায়ের নামই যোগ। এই অধ্যবসায়ের বলেই মানব নিজেই নিজের জন্য স্বর্গের সিঁড়ির গঠন করিয়া থাকে। এই বাক্যটি অদ্য হইতে এক দীক্ষা মন্ত্র বলিয়া গ্রহণ কর।" এই বলিয়া গুরুদেব নিম্নের শ্লোকটি আবৃত্ত করিলেন ;—

"পিত্বা পিত্বা পুনঃ পিত্বা পতিতে ধরণীতলে।
উত্থায় চ পুনঃ পিত্বা জন্ম মৃত্যু র্ণ বিদ্যতে।"

বলাই চারি পাঁচ বার উচ্চৈঃস্বরে বচনটি আবৃত্তি করিলেন।

গুরুদেব কহিলেন,—"বলাই, কল্য তোমাকে একবার রাজধানী গমন করিতে হইবে। তথায় যে যে কার্য্য করিতে হইবে তাহা যাইবার সময় সবিশেষ বলিয়া দিব। এক্ষণে গৃহমধ্যে আইস।" এই বলিয়া গুরুদেব বলাইএর সঙ্গে নিকটস্থ ভগ্ন-গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন।
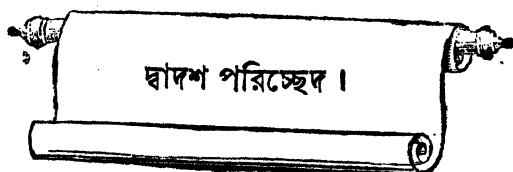
যিনি যেমন দেবতা, তাঁহার বাহনও তদুপোযোগী ; তাই কার্ত্তিকের বাহন ময়ূর আর গণেশের বাহন মুষিক। যিনি যে ভাবের লোক, তাঁহার সঙ্গীও জুটে তেমনি প্রকৃতির লোক।

সুরেন্দ্রমোহন ভাবুক ব্যক্তি, সুরেন্দ্রের জীবন সহচর জুটিয়াছেন কবি রামতারণ ; সুরেন্দ্র সরল প্রকৃতির লোক, সুরেন্দ্রের সখা জুটিয়াছেন আহাম্মুখ শিবদাস।

রামতারণ বাবু ধীরে ধীরে গঙ্গাতীরে সান্ধ্য ভ্রমণ করিতেছেন। শিবদাস তাঁহার পিছু পিছু ছড়ি ঘুরাইতে ঘুরাইতে শিসে গান করিতে করিতে চলিয়াছেন। আর মধ্যে মধ্যে কর্ণ হইতে পাররার পালক লইয়া কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট করাইয়া ঘুরাইতেছেন। উভয়ে অনেক ক্ষণ এইরূপে নীরবে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। পরে শিবদাস কহিল,—"আপনি কি বোবা হইয়াছেন ?" রামতারণ বুঝিলেন,—তাঁহার নীরব ভ্রমণে শিবদাস কিছু বিরক্ত হইয়াছে। রামতারণ কহিলেন "শিবদাস বলিবার ত আর কিছুই নূতন খুঁজিয়া পাই না

ভাই।” শিবদাস পরিহাস করিয়া কহিল,—“বাহাত্তুরে পাইলে লোকের নানা দশা ঘটিয়া থাকে। তার মধ্যে এই সবজান্তার ভাবটা এক বড় বিষম ভাব।” ‘বাহাত্তুরে’ বিশেষণটি রামতারণের কর্ণে একটু বাজিল। রামতারণ বাবুর কর্ণ এ পর্য্যন্ত অনেক বিশেষণের উপহার লাভ করিয়াছে এবং প্রকৃত বিরাগী পণ্ডিতের ন্যায় নির্ব্বিকার চিত্তে কর্ণ সে সকল বিশেষণে উপেক্ষা করিয়াছে; কিন্তু এবারে বাহাত্তুরে বিশেষণটি সে সহ্য করিয়া উঠিতে পারিল না; সুতরাং, রামতারণ একটু চটিলেন। রামতারণের ক্রোধ এ জগতে অতি অল্প লোকেই দেখিয়াছে। আমরা ত অন্ততঃ এই প্রথম দেখিলাম বলিতে পারি। রামতারণ চটিয়া কহিলেন,—“আমাকে তুমি বাহাত্তুরে ঠাওরাইলে কিসে? তুমি কি নিজে কচি খোকা!” রামতারণের ক্রোধ দেখিয়া শিবদাস বড় খুসী হইল।

এইরূপ ক্রোধে শত্রু ত দমিত হয় না—ইহাতে কেবল শত্রুকে আপনার দুর্ব্বলতার ছিদ্র প্রদর্শন করান হয়। শত্রু সেই গৃহছিদ্রের পথ পাইয়া নানা সূত্রে লাঞ্ছনা করিবার চেষ্টা করে। বুদ্ধিমান্ যিনি—তিনি এই ছিদ্র সর্ব্বদাই শত্রুর নিকট হইতে গোপনে রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন।

সরলপ্রাণ শিবদাস কিন্তু রামতারণের এই ছিদ্র পাইয়া আনন্দিত হয় নাই। সে যে রামতারণ বাবুকে মধ্যে মধ্যে এই কথার বাগে পাইয়া এক হাত লইবে, তাই ভাবিয়া সে সুখী হইয়াছিল। শিবদাস কহিল,—“তা আপনি অত রাগ করিতেছেন কেন? আপনাকে ত আর এ বয়সে কেহ কন্যা প্রদান করিতে আসিতেছে না।” গায়ে কাঁটা ফুটিল—রামতারণের ক্রোধ অগ্নি

প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। রামতারণ কহিলেন—"শিবদাস তোমার লঘু গুরু ভেদাভেদ নাই জ্ঞান।" রামতারণ আপন পায়ে আপনি কুঠারাঘাত করিলেন। রামতারণ শিবদাসকে ছেলে মানুষ বলিয়া স্বহস্তেই আপনাকে বৃদ্ধ বানাইলেন। বিষধর নির্ব্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পারে?

শিবদাস হা-হা করিয়া উচ্চ হাস্যের তরঙ্গ ছুটাইল। হাসিয়া কহিল,—"রামতারণ বাবু, নিজ মুখেই কবুল ডিক্রি দিলেন।" রামতারণ বাবু স্বীয় দুর্ব্বলতা বুঝিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। উচ্চ-হৃদয় ব্যক্তি এইরূপ আপন দুর্ব্বলতায় আপনি হাসে, আর অপরের দুর্ব্বলতায় রোদন করে।

রামতারণ কহিলেন,—"শিবদাস, অন্ধকার হইয়া আসিল। চল, বাড়ী ফিরা যাউক।" শিবদাস গম্ভীর স্বরে কহিল,—"একটু অপেক্ষা করুন, একটা কথা বলিব।"

রামতারণ। চল, যাইতে যাইতে বলিবে।

শিব। না, তাহা হইবে না, কথাটা কিছু গুরুতর—এই খানে বসিয়া শুনুন।

শিবদাসের মুখে গুরুতর কথা! রহস্য বড় মন্দ নয়। রামতারণের কৌতুহল বাড়িল। ভাগীরথীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া কহিলেন,—"কি হে শিবদাস, ব্যাপারটা কি?"

শিবদাস চুপে চুপে রামতারণের কর্ণমূলে কি একটি কথা কহিল। রামতারণ চমকাইয়া বলিলেন,—"কি বল শিবদাস!"

শিবদাস। বল্‌বো কি আর মাথা মুণ্ডু মশাই! কথা সত্য, আমার স্বকর্ণে শুনা।

রাম। সুরেন্দ্র বাবুর কাছে এর কিছু ভেঙ্গেছ কি?

শিবদাস। বলেছিলেম। শুনে ত আমায় পাগল বলে হেসে উড়িয়ে দিলেন। বলিলেন,—'শিবদাস, তুমি ভুল শুনিয়াছ। শশীবাবু একজন মহা ধার্ম্মিক লোক।'

রাম। সে কথা শুনিয়া তুমি কি বলিলে?

শিবদাস। ক্রোধে আমার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল। আমি বাহির হইয়া আসিলাম। ভাবিলাম, এ পৃথিবীতে আর কাহাকেও কখনও ভাল কথা বলিব না; কিন্তু—

রাম। সে টা ত প্রকৃত বন্ধুত্বের কার্য্য নয়। এখন উপায় কি বল দেখি?

শিব। আমি তার কি বলিব? আমার যাহা বলিবার ছিল, তাহা বলিয়াছি। এক্ষণে আপনার যদি কিছু নূতন বলিবার থাকে, তবে বলুন, শুনিতেছি।

রামতারণ বাবু এক হস্ত মস্তকে প্রদান করিয়া অপর হস্তে শ্বেতকৃষ্ণবর্ণ বিমিশ্রিত গোঁপ জোড়াটি নানাবিধ আকারে পাকাইতে লাগিলেন। অনেকে বলেন, বাঙ্গালীর সুখ দুঃখ সুচিন্তা কুচিন্তার সাথী তামাকু। আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বোধ হয় অধুনা শ্মশ্রুকুলও নিতান্ত ফেলিবার সামগ্রী নহে।

ক্রমে অন্ধকারের ঘোরে রামতারণ বাবু ও শিবদাস ডুবিয়া গেলেন। ছিন্নবাস—মলিন কন্থা সংযুক্ত একটি লোক আসিয়া তাঁহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল। অন্ধকারে তাহার মুখাকৃতি ভাল দেখা গেল না।

লোকটি রামতারণের সম্মুখে আসিয়া কহিল,—"মহাশয়, কলিকাতায় কি ধর্ম্মশালা নাই?"

রামতারণ বিরক্তভাবে কহিলেন,—"তাহা জানি না বাপু; অন্য স্থানে যাইয়া জিজ্ঞাসা কর, সন্ধান পাইবে।"

রামতারণ জীবনে আর কখনই মানুষের কথায় মুখে সাড়া দেন নাই। অদ্য তাঁহার প্রশান্ত প্রকৃতিতে বিষম এক তুফানের উত্তরোল উত্থিত হইয়াছে। শিবদাসের কথায় তিনি এখন চতুর্দ্দিক্ অগ্নিময় দেখিতেছেন তাই, আজি মানুষ রামতারণের মুখে মুখ সাড়া পাইল।

রামতারণ শিবদাসকে বিষম আহাম্মুখ বলিয়াই জানিলেন। শিবদাসের পনের আনা কথা যে অসার অসংলগ্ন, তাহাও তিনি বুঝিতেন; কিন্তু শিবদাস যে সুরেন্দ্রমোহনের অকৃত্রিম বন্ধু এবং শিবদাস যে সাধারণতঃ মিথ্যা কথা বলে না, এ বিশ্বাসও তাঁহার দৃঢ় ছিল। রামতারণ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া কহিলেন,—"শিবদাস, এখন উপায় কি বল দেখি?"

গোঁয়ার শিবদাস কহিল,—"আমার যুক্তি যদি শুনেন, তবে এখনি এক কাজ করুন। এখনই ঐ দুই ব্যাটা বেটীকে ঝাঁটা মারিয়া দূর করিয়া দিন, এক দণ্ডও আর তাহাদিগকে বাটীতে থাকিতে দেওয়া উচিত নয়; কিন্তু সে কথা কি সুরেন্দ্র শুনবে? তাকে বেটী একেবারে যাদু করে রেখেছে, সে এখন মন্ত্র ঔষধির বাহির হইয়া পড়িয়াছে।"

রাম। তা আমি বুঝি; কিন্তু ও বাড়ীতে থাকিলে ত সুরেন্দ্রমোহনের নিস্তার দেখি না। বোধ করি, দুই এক দিনের মধ্যেই তাহাকে প্রাণে বধ করিবে।

শিব। তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সম্মুখস্থ অপরিচিত ব্যক্তিটি এখন পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়াছিল।

সে কহিল,—"মহাশয়, সুরেন্দ্রমোহনের প্রাণের কোন আশঙ্কা নাই। তবে তাহাকে পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্ত কিছু ভুগিতে হইবে।"

শিবদাস তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল,—"কে রে ব্যাটা তুই? ব্যাটা বুজরুকী ফলাবার আর জায়গা বুঝি কোথাও পেলে না? ডাক্ ত পাহারাওয়ালা,—মজাটা দেখাব একবার!"

আগন্তুক কহিল,—"অকৃতজ্ঞ মানব! তুমি আর কত কাল পৃথিবীকে দগ্ধ করিবে?"

ভাবগ্রাহী রামতারণ বাবু কথাটি শুনিয়া বুঝিলেন, লোকটি নিতান্ত ইতর শ্রেণীর নহে। কহিলেন,—"মহাশয়,দেখুন আমাদের সম্মুখে বড় বিপদ্; আমাদের এখন কিছুই ভাল লাগে না, আপনি কি চান তা খুলে বলুন।"

শিবদাস ব্যঙ্গস্বরে কহিল,—"চাইবেন আর কি আমাদের মাথামুণ্ডু! গতিক বুঝ্‌তে পাচ্চেন না?"

আগন্তুক। কিছুই চাহি না মহাশয়, সুরেন্দ্রমোহনকে একবার চক্ষে দেখিতে চাই।

শিব। আহা—হা! সাক্ষাৎ যেন শচীমাএর ব্যাটা চৈতন্য এসে দাখিল হলেন! জগাই মাধাই উদ্ধার কর্ব্বে বাবা! দেখ বাপু, আমরা কোল্‌কেতার ছেলে, তোমার মত বিট্‌লে সাধু এ বয়সে ঢের দেখেছি বাবা!"

আগন্তুক গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"যে অর্থলোভী—সাধুর বেশে সংসারীর দ্বারস্থ হয়, সেই ভণ্ড নীচ এবং তোমার ন্যায় ব্যক্তির ঘৃণার পাত্র। আর যে অর্থকে সামান্য কীটাপেক্ষাও তুচ্ছ মনে করে, সে কখনই লঘুচেতাগণের ঘৃণার পাত্র নহে।"

শিব। যাও না বাপু, নিজের কাজ দেখ গে না, মিছে কোন বক্‌বক্‌ করে মাথা ধরাও! এতক্ষণ যে হাটখোলার ছুটো দোকান খুলে দু পয়সা রোজ্‌গার কর্ত্তে পার্ত্তে।

রামতারণ কহিলেন,—"শিবদাস, ক্ষান্ত হও। এর মধ্যে একটু কিছু গূঢ় রহস্য থাকিতে পারে।" এই বলিয়া আগন্তুকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"মহাশয়, সুরেন্দ্র বাবুর নিকট আপনার আবশ্যক কি?"

আগ। তাঁহারই সম্মুখে শুনিবেন।

রাম। "আসুন, তবে আমাদের সঙ্গে।" এই বলিয়া তিন জনে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

পৃথিবীতে এমন কতকগুলি লোক আছে, যাহারা বলে, এ সংসারে যত কু-ঘটনা ঘটে, সে সকলের মূল কারণই পুরুষ। আবার পক্ষান্তরে এমন লোকও নিতান্ত বিরল নয়, যাহারা বলে যে, পুরুষ সংসারে রজকের গর্দ্দভ বিশেষ; পুরুষ আহরণ পর্য্যটন করিয়া খালাস—ভাঙ্গা গড়া যত কিছু সে সকলই রমণীর হস্তগত। পাঠিকা, আপনি কোন্ দলভুক্ত? পাঠক মহাশয়কে অবশ্যই আমার দলভূক্ত বলিতে হইবে।

নিরুপমা বাহিরের বৈঠকখানায় আসিয়া একখানি কৌচের উপর অর্দ্ধশায়িত ভাবে বসিয়া পড়িলেন। পশ্চাতে পশ্চাতে শশিভূষণ আসিয়া এক খানি চেয়ার টানিয়া তাঁহার সম্মুখে বসিল।

শশী কহিল,—"নিরু, ওধারের ব্যাপার ত সকলই একরূপ ঠিক্ হইল। এখন কোন গতিকে সুরেন্দ্রমোহনকে একেবারে বাটী হইতে বাহির করিয়া না দিলে ত কার্য্যে সুবিধা হইবে না।"

নিরুপমা বিরক্তভাবে কহিল,—"শশি, আমার বড় মাতা

ধরিয়াছে। তুমি যা ভাল বুঝ, তাহাই কর। আমাকে আর এখন কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিও না।”

শশিভূষণ হাসিয়া কপালে করাঘাত করিয়া কহিল,—“আহা! ভারতচন্দ্র কি লেখাই তুমি লিখিয়া গিয়াছ—‘যার জন্য চুরি করি, সেই বলে চোর!’ তা দেখ নিরু, আর মিছা কেন এ সব গণ্ডগোল! স্পষ্ট বল্লেই হয়, আমি অন্য পথ দেখি। আমার কি? আমি ত ধর্ম্মপথের পথিক হয়ে একরূপ দাঁড়াইয়াছি বলিতে হইবে। তবে যে এত দিন ঘুর্‌ছিলেম, সে কেবল একটা প্রাণের টান বৈ ত আর কিছু নয়। তা—তুমি—সোজা কথায় বল্লেই পার, আপন পথ দেখি।”

নিরুপমা। এই দেখ! আমি আর মন্দ কথাটা বল্লেম কি ছাই! আমি মেয়ে মানুষ, হাজার লেখাপড়া শিখি আর যাই করি, আমি কি সকল কাজের পরিণাম বুঝ্‌তে পারি? তোমার হাতে ত সকলই বুঝিয়ে দিয়েছি, তোমার যা ভাল বিবেচনা হয়, তাই কর। আমার কি তায় কোন অমত আছে?

শশী। দেখ, এক কাজ করা যাউক। সুরেন্দ্র আজি আসিলে, তাহাকে একেবারে বাড়ী হইতে বাহির করিয়া দেওয়া যাউক। আমি দরোয়ান্ গুলোকে আগেই হাত করে রেখেছি।

নিরু। তোমার যা ভাল বোধ হয়, তাই কর; রাখ্‌তে হয় রাখ, কাট্‌তে হয় কাট। আমার আর কোন আপত্তি নাই। কিন্তু একটা কাজ করিও, তাহার আহার হইলে পর তাড়াইয়া দিও।

"তুমিও যেমন, তাহার আবার খাওয়া দাওয়া! যাবার সময় দুটো পেস্তা কিস্‌মিস্ হাতে দিও, খেতে খেতে চলে যাবে।" এই বলিয়া শশিভূষণ ডাকিল,—"ওরে যেদো! ও ভজন সিং!" আহ্বানের সহিত দ্বারবান্ দ্বয় আসিয়া উপস্থিত হইল। শশিভূষণ কহিল,—"কেমন যেদো! যা বলেছি, তা পার্ব্বি ত?"

যেদো ও ভজন সিং উভয়ে এক বাক্যে কহিল,—"কর্ত্তা,মুখে বল্‌ব কি! কাজের সময় যাচিয়ে নেবেন।"

শশী। যেদো, আমি যে, হুকুম দেবো, সেই ঘাড় ধরে সুরেন্দ্রকে বার করে দিবি। আমি আজ থেকে তোদের মুনিব— খুব সুখে থাক্‌বি ব্যাটারা! বুঝেছিস ত?

যেদো ও ভজন সিং একটু সঙ্কুচিত ভাবে নিরুপমার দিকে তাকাইতে লাগিল। নিরুপমা কহিলেন্,—"ভয় কি যেদো! তোদের আমার হুকুম রইলো। শশী বাবু যেমন বল্‌বেন, তেমনি কার্য্য তোরা।"

নিরুপমার কথা শুনিয়া যেদো ও ভজন সিংএর সংকোচ ভাব দূর হইল। যেদো সদর্পে কহিল,—"আপনার হুকুম পেলে, যমকে তাড়িয়ে দিতে পারি—সুরেন্দ্রবাবু ত একটা ছোট মানুষ!"

শশিভূষণ কহিল,—"তোরা কিছু আগাম বকৃসিস নে।" এই বলিয়া যেদোর হাতে শশিভূষণ ২০টি টাকা দিল। উভয়ে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল।

প্রায় মিনিট পনের পরে অতি দীনভাবে সুরেন্দ্রমোহন নিজ বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সুরেন্দ্রমোহনের আকৃতি আজি

বড়ই শোচনীয়—দেখিলে বোধ হয়, যেন সুরেন্দ্রমোহনের মৃত্যু অতি আসন্ন।

সুরেন্দ্র বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলে, নিরুপমা ও শশিভূষণ উভয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল ও টিপিয়া টিপিয়া হাসিতে লাগিল। উভয়ের এ হাসিতে সুরেন্দ্রমোহন আজি বিষম কালকুটের তরঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। সুরেন্দ্র-মোহন দেখিলেন, শশিভূষণ ও নিরুপমা আজি সহস্র বিষধরের মূর্ত্তি ধরিয়া তাঁহাকে দংশিতে উদ্যত। শিবদাসের কথা শুনিয়া অবধি সুরেন্দ্রের মনে যে এক সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল, এক্ষণে নিরুপমা ও শশিভূষণের ভাবগতিক দেখিয়া সে সন্দেহে আর কোনই সন্দেহ রহিল না। সুরেন্দ্র জড়বৎ স্তম্ভিত হইলেন। একটু দাঁড়াইয়া সুরেন্দ্র মস্তকে দুই হস্ত দিয়া একেবারে ম্যাটিং-এর উপর বসিয়া পড়িলেন।

সুরেন্দ্র কি সত্যই সৎসাহসহীন কাপুরুষ? না—তাহা নহে, সুরেন্দ্রমোহন কাপুরুষ নহেন। সুরেন্দ্রমোহন সরল-প্রকৃতি তরলমতি যুবক। সংসারে যে এতদূর বিষময় কাণ্ড সত্যই ঘটিতে পারে, এ ধারণা তাঁহার পূর্ব্বে ত ছিল না। এত দিন পরে তাঁহার সংসার-চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল। নবদৃষ্টিলাভ করিয়া সুরেন্দ্র দেখিলেন, ভীষণ নরক ইহ লোকেই অবস্থিত। সেই নরকের দৃশ্যে সুরেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন। সুরেন্দ্র কাপুষ নহেন।

সুরেন্দ্রকে ম্যাটিংএর উপর বসিয়া পড়িতে দেখিয়া জঘন্য বিকট হাস্য হাসিয়া শশী কহিল,—"সুরেন্দ্র বাবু, আজি একবার সাধের ইজি চেয়ারে শুইয়া লউন।"

সুরেন্দ্র দাঁড়াইয়া কহিলেন,—"তাহা আমি বুঝিয়াছি। শশি, তুমি যে ধর্ম্মের আচ্ছাদনে ভয়ঙ্কর নরপিশাচ তাহা আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছি। তোমার সহিত অধিক বাক্য ব্যয় করিতে চাহি না। সহজে বলিতেছি আমার গৃহ হইতে তুমি এখনই চলিয়া যাও; নতুবা, অপমানিত হইবে।" শশিভূষণ বিকট হাসিয়া কহিল,—"সুরেন, আমি তোমায় হুকুম করিতেছি, তুমি এখনই বাহির হইয়া যাও; নতুবা, তোমার কপালে আজি বিষম বিড়ম্বনা আছে।"

এই কথা শুনিয়া সুরেন্দ্র কহিলেন,—"নিরুপমা, ভিতরে যাও।" নিরুপমা হাসিয়া কহিল,—"আমি ভিতরে যাইলে কি তোমার আব্‌রু রক্ষা হইবে?"

সুরেন্দ্র সদর্পে কহিলেন,—"পিশাচি! তুই কি মনে করিস্ নাই যে, তোকে লইয়াই আমার আবরু? তুই বারবিলাসিনীর ন্যায় সামান্য ভোগ্যা রমণী মাত্র; কিন্তু তাহা হইলেও তোর নিকট আজি আমি এক মহাশিক্ষা লাভ করিলাম। তুই আমাকে হাতে হাতে বুঝাইয়া দিলি যে, আজিও ধর্ম্ম আছেন, আজিও পাপের প্রায়শ্চিত্ত ইহ জগতে হইয়া থাকে।"

এই পর্য্যন্ত বলিয়া সুরেন্দ্রের কণ্ঠরোধ হইল। সুরেন্দ্র আবার কাঁদিয়া কহিলেন,—"আমি যেমন অনায়াসে নির্দ্দোষ সরলা বালাকে পাএ ঠেলিয়া তোর ন্যায় কুহকিনীর হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম, তেমনি হাতে হাতে তাহার ফল ভোগ করিলাম। নিরুপমে, এখনও আমার পাপের সম্যক্ প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই। শিবদাসের নিকট যে কথা শুনিয়াছিলাম, যদি কার্য্যে তাহাই তুই করিতে পারিতিস, যদি তুই কোন রূপে

স্বহস্তে এ পাপ প্রাণ বিনাশ করিতে পারিতিস, তবেই আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইত। আমি মস্তক পাতিয়া দিতেছি, তুই আমাকে হত্যা কর্; আমি তাহাতে কিছু মাত্র বাধা দিব না।" এই বলিয়া সুরেন্দ্র উন্মাদের ন্যায় নিরুপমার সম্মুখে যাইয়া মস্তক অবনত করিলেন। নিরুপমা মুখ ফিরাইয়া পাষাণের ন্যায় স্থির হইয়া রহিল।

শশিভূষণ হাসিয়া সুরেন্দ্রের সম্মুখে আসিয়া কহিল "মূর্খ! মরণ তোমার আজ আমার হাতে।" শশিভূষণ এই কথা বলিবা-মাত্র সুরেন্দ্র সজোরে তাহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিলেন। শশিভূষণ পড়িয়া গেল। উঠিয়া উচ্চৈঃস্বরে "যেদো, শীগ্গির আয় রে!" বলিয়া ডাকিতে লাগিল। যেদো ও ভজন সিং উপস্থিত হইলে, শশী কহিল,—"যেদো, এই চোর ব্যাটাকে বল্‌চি বার করে দে ত।"

শুনিয়া যেদো ও ভজন সিং নিরুপমার দিকে তাকাইল। নিরুপমা ইঙ্গিত করিবা মাত্র উভয়ে সুরেন্দ্রমোহনের দুইপার্শ্বে দাঁড়াইয়া কহিল,—"ভাল চাও ত তুমি নিজে বাহির হয়ে যাও বল্‌চি।"

সুরেন্দ্র অবাক্ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"আমি কি পাগল হইয়াছি, অথবা স্বপ্ন দেখিতেছি?"

সুরেন্দ্রের এই ভাব দেখিয়া ভজন সিং যেদোকে কহিল,— "আরে বাউরা দেখ্‌ছিস্ না,—বাবু বাউরা বল্‌ছে। জলদি বাহির কর্।" এই বলিয়া উভয়ে সুরেন্দ্রমোহনের শরীর আবেষ্টন করিয়া হিঁচড়াইয়া লইয়া যাইতে লাগিল। সুরেন্দ্র চড়,কিল, ঘুঁষা লাথি ছুঁড়িতে লাগিলেন। শশিভূষণ, "পাহারাওয়ালা, চোর! পাহারা-

ওলা, চোর!" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। ইতি মধ্যে যেদো ও ভজনসিং উভয়ে ঠেলিতে ঠেলিতে দুর্ব্বল সুরেন্দ্রমোহনকে বাটীর সদর দরওয়াজার নিকট লইয়া আসিল। পাহারাওয়ালা বিবাদের কোন আশঙ্কা নাই দেখিয়া বীরপরাক্রমে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। শশিভূষণ পাহারাওয়ালাকে এক পার্শ্বে ডাকিয়া তাহার দক্ষিণ হস্তের উপর নিজ দক্ষিণ হস্ত স্থিত করিল। পাহারাওয়ালা আর বড় গোলযোগ করিল না। একেবারে সজোরে সুরেন্দ্রমোহনের হস্তদ্বয় ধরিয়া টানিয়া বড় রাস্তায় উপস্থিত হইল। অপর ২।৩ জন পাহারাওয়ালা ও কয়েক জন বাজে লোক জুটিয়া গেল। শশিভূষণ এই সকল পাহারাওলা-দিগকেও উক্ত ক্রিয়া করিতে ক্রটি করিল না। পাহারাওয়ালাগণ সকলে মিলিয়া ধাক্কা দিতে দিতে সুরেন্দ্রকে লইয়া চলিল।

শশিভূষণ সাধু হইয়া, সুরেন্দ্রের বাড়ীর মধ্যে মালিক হইয়া আসিয়া, সদর দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। সুরেন্দ্র চোর হইয়া শান্তিরক্ষকদিগের আঘাত খাইতে খাইতে পুলিশষ্টেশন অভি-মুখে চলিলেন।

এই ঘটনার এক ঘণ্টা পরে রামতারণ আগন্তুককে লইয়া উপস্থিত হইলেন। দরজায় আঘাত করিয়া'সুরেন বাবু!' 'সুরেন বাবু!' বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। কিন্তু কোথায়ই বা সুরেন বাবু, আর কোথায়ই বা তাঁহার আহ্বান! সুরেন্দ্রমোহন কল্য যে বাড়ীর অধিকারী ছিলেন, অদ্য তিনি সেই বাড়ীতেই চোররূপে বন্দী হইয়াছেন।

রামতারণ বাবু সুরেন্দ্রের কোন উত্তর না পাইয়া বাড়ীর পশ্চাৎদ্বারে যাইয়া ডাকিবার উদ্যোগ করিতেছেন, এমন সময়ে

পার্শ্বস্থ দোকান হইতে একটি মুদি কহিল,—“মহাশয়,আপনাদের বাবুকে পাহারাওয়ালায় ধরিয়া লইয়া গিয়াছে।” রামতারণ আশ্চর্য্যভাবে কহিলেন,—“সে কি! কেন? কোন সাক্ষীর হাঙ্গামায় পড়িয়াছেন কি?” মুদি কহিল,—আজ্ঞে না, আপনি কি কিছুই জানেন না? চুরির আসামী রূপে তিনি গ্রেপ্তার হইয়াছেন।” রামতারণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া স্তম্ভিতরূপে দাঁড়াইয়া রহিলেন। আগন্তুক কহিলেন,—“মহাশয়, আমি তবে এক্ষণে চলিলাম। আপনার আবার কোথায় সাক্ষাৎ পাইব?”

রাম। মহাশয়, দেখিতেছেন ত কাণ্ড! আমাদের চতুর্দ্দিকে এক্ষণে বিপদ্‌জালবেষ্টিত আমার এখন মস্তকের ঠিক নাই। যথার্থ উত্তর আপনাকে কিরূপে দিই? তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারিব যে, শিবদাস বাবুর বাটীতে আমায় অনুসন্ধান করিলে সাক্ষাৎ হইতে পারে।

আগ।“তাঁহার বাড়ীর ঠিকানা ত জানি না।”রামতারণ কহি-লেন,“আমার সঙ্গে আসুন। আমি এক্ষণে তাঁহারই বাটীতে যাইব। তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া সুরেন্দ্র বাবুর অনুসন্ধানে বাহির হইব।”

এই কথার পরে উভয়ে যাইতে লাগিলেন। একটু যাইয়া রামতারণ কহিলেন,—“মহাশয়ের পরিচয় কিছু জানিতে বড় ইচ্ছা হইতেছে।” আগন্তুক বিনীত ভাবে কহিলেন,—“ক্ষমা করিবেন। পরিচয় প্রদান আমাদের দলভুক্ত ব্যক্তিগণের নিয়ম বিরুদ্ধ।”

রামতারণ আর কিছুই কহিলেন না। এক মনে গম্ভীর-ভাবে আগন্তুককে সঙ্গে লইয়া চলিতে লাগিলেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।
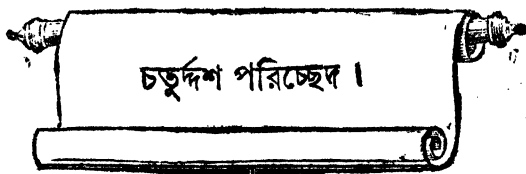
অদ্য পার্ব্বতীর দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের দিবস উপস্থিত। প্রাতে শিষ্যবর্গের সহিত গুরুদেব আসিয়া স্বয়ং বেদীতে উপবেশন না করিয়া বেদীর বামপার্শ্বস্থ অজিন আসনে উপবিষ্ট হইলেন। শিষ্যবর্গ চতুষ্পার্শ্বে তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিল। সকলেরই মূর্ত্তি স্থির ও গম্ভীর। কাহারও মুখে কথাটি নাই। সকলেই যেন শ্বাস প্রশ্বাস বিহীন, চক্ষু পলকবিহীন প্রস্তর পুত্তলের ন্যায় প্রশান্ত।

যদি শিষ্যগণের প্রশান্ত মুখমণ্ডলে কোনরূপ ঔৎসুক্য-ব্যঞ্জক চিহ্ন পরিলক্ষিত না হইত, তবে কেহই তাঁহাদের তাৎকালিক মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাদিগকে কেহ জীবিত মনুষ্য বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারিত না। গুরুদেব কি বলেন শুনিবার নিমিত্ত শিষ্যগণ প্রতি মুহূর্ত্তে বিশেষ আগ্রহের সহিত অপেক্ষা করিতেছিলেন।

প্রায় এক দণ্ড কাল স্থিরভাবে থাকিয়া গুরুদেব গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"বলাইএর এতক্ষণ ফিরিয়া আসা উচিত ছিল। বলাইএর অনুপস্থিতিতে বিচারকার্য্য সমাধা করিতে তোমাদের অভিপ্রায় কি?"

শিষ্যবর্গ বিষম সঙ্কটে পড়িলেন। পাছে মনোজ্ঞ না হয়, এই ভয়ে গুরুদেবের সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর প্রদান করিতে শিষ্যগণ অনেক সময় বড়ই সঙ্কুচিত হইতেন ও ইতস্ততঃ করিতেন। গুরুদেব শিষ্যগণের এই সঙ্কোচে তাঁহাদের মানসিক দুর্ব্বলতা দেখিয়া সন্তুষ্ট না হইয়া বরং বিশেষ বিরক্তির ভাবই প্রকাশ করিলেন। কিন্তু দুর্ব্বল মানব প্রকৃতি সকলকে নিজের ন্যায় দেখে ও সত্য পথ ছাড়িয়া তোষামোদের উপহারে সাধুর মন ভুলাইতে চায়।

বর্ত্তমান প্রশ্নে শিষ্যগণের সঙ্কোচ ভাব দেখিয়া গুরুদেব বিরক্তি ভাবে কহিলেন,—"অদ্য যে কেবল পার্ব্বতীর বিচারের দিন, এমন কেহ মনে করিও না; অদ্য তোমাদের এক পরীক্ষার দিবস। দেখ, সহস্র সহস্র শিষ্য আমার নিকট দীক্ষালাভের আশয়ে আসিয়াছে; তন্মধ্যে এ পর্য্যন্ত শত শত জনের অধিক আমার শিষ্যশ্রেণী ভুক্ত হইতে সমর্থ হয় নাই। আমার নির্দ্ধারিত নিয়মের কঠোরতা দেখিয়া অনেকে ভগ্নমনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। যাহারা ফিরিয়া গিয়াছে, তাহারা অবশ্য বিশেষ কোন সাংসারিক কারণে বিরক্ত হইয়া বৈরাগ্যের পন্থা অবলম্বনে আসিয়াছিল। তাহারা বুঝে নাই যে, সংসার-বিরক্তি-জনিত বৈরাগ্য, চঞ্চল-স্বভাব-সুলভ—অতি ক্ষণ স্থায়ী। আধ্যাত্মিক উন্নতি বা কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধন যে সংসার বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য, তাহাই চিরস্থায়ী হয়। সেই বৈরাগ্যই হৃদয়ের চির রক্ষাকর্ত্তা হইয়া সর্ব্ব প্রকার রিপুকুলকে সর্ব্বক্ষণ দমন করিয়া রাখিতে সমর্থ। এ পর্য্যন্ত যতদূর জানিয়াছি, তাহাতে বোধ হয় তোমাদিগের বৈরাগ্য সংসার-জনিত নহে, এবং তোমরা

যেরূপ আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছ, তাহাতে বুঝিয়াছি যে, তোমাদের উদ্দেশ্য স্বার্থবিহীন এবং অতীব মহৎ কিন্তু সেই মহৎ উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিবার শক্তি অদ্যাপি তোমাদের কাহারও জন্মিয়াছে কি না, তাহাতে আমার বিশেষ সন্দেহ আছে; কেননা সৎসাহস প্রবণতায় তোমাদের মধ্যে কেহই আত্মবলি দিতে সমর্থ নহে।

শিষ্যবর্গ অধোবদন হইয়াছিলেন। দুইজন শিষ্য সমভি-ব্যাহারে ধীরপদবিক্ষেপে কুণ্ডলা বেদীর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।

গুরুদেব কহিলেন,—"কুণ্ডলা, তুমি এই বনস্থলীর রাজ্ঞী। এই মৃত্তিকার বেদীই তোমার উপযুক্ত বেদী, ইহাতে উপবেশন কর।"

কুণ্ডলা বেদীতে উপবেশন করিল। কুণ্ডলার আজি আর সে বেশ সে ভূষা নাই। কুণ্ডলার কমনীয় দেহ আজি কঠিন চর্ম্ম বর্ম্মে আবৃত। কুণ্ডলার বেশের সহিত তাহার সে বালিকা মূর্ত্তিও অন্তর্হিত হইয়াছে।

গুরুদেব কহিলেন,—"কুণ্ডলা, অতঃপর আর্য্যাবর্ত্তের বনরাজী তোমার বিস্তীর্ণ রাজ্য, আর বন্যজন্তুর ন্যায় জ্ঞানহীন, বিধিহীন বর্ব্বরগণ তোমার প্রকৃতিপুঞ্জ হইবে। অদ্য যে সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছ, উহা তোমার পরীক্ষার আসন মাত্র। অদ্য বুঝা যাইবে তুমি রাজসিংহাসনের প্রকৃত উপযুক্ত এবং স্বীয় বংশের উপযুক্ত কন্যা কি না।" এই কথা বলিয়া গুরু-দেব ও শিষ্যগণ নিজ নিজ স্থানে উপবেশন করিলেন। গুরু-দেব উপবেশন করিয়া ধ্যানমগ্ন হইলেন। সকলেই চক্ষু

মুদ্রিত করিলেন। কেবল কুণ্ডলা এ গম্ভীর দৃশ্য দেখিতে পাইল।

গুরুদেব ধ্যান সমাধা করিয়া আবার উপবেশন করিলেন। উঠিয়া কহিলেন,—"কুণ্ডলা, আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।" কুণ্ডলা মস্তক অবনত করিল। গুরুদেব হস্তস্থিত তীক্ষ্ণ ছুরিকা দ্বারা স্বীয় বক্ষঃস্থল ক্ষত করিয়া, তাহা হইতে রক্ত গ্রহণ করিয়া কুণ্ডলার মস্তকে অভিসিঞ্চন করিলেন এবং শোণিতের অবশিষ্টাংশ অন্যান্য শিষ্যবর্গের গাত্রে বর্ষণ করিলেন। নিজ হস্তস্থিত ছুরিকা কুণ্ডলার হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন,—"কুণ্ডলা, ছুরিকা গ্রহণ কর। আর্য্যধর্ম্মের বীজে ইহার প্রাণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার প্রাণ সজীব রাখিও।" গুরুদেব আর কথা কহিতে পারিলেন না, তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। সাবধানে আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিয়া আবার কহিলেন,—"কুণ্ডলা,তুমি রাজপুত দুহিতা নহ। যুদ্ধ তোমার ধর্ম্ম নহে। তুমি ক্ষুদ্রপ্রাণী বাঙ্গালী তনয়া; অসিতে তোমার আবশ্যক নাই। বাঙ্গালী রমণীর ধর্ম্মরক্ষার জন্য সামান্য ছুরিকাই যথেষ্ট। আর তুমি যে রাজ্যের রাজা হইবে, তথায় অসিবল হইতে ধর্ম্মবল প্রবল হইবে।" এ কি কথা! কুণ্ডলা ক্ষুদ্রপ্রাণী বাঙ্গালী বালিকা!

কুণ্ডলা অবনত মস্তকে গুরুদেবের হস্ত হইতে ছুরিকা গ্রহণ করিল। গ্রহণকালে কুণ্ডলার কোমল বাহু ঈষৎ কম্পিত হইল। তাহা কুণ্ডলা নিজে ও গুরুদেব ব্যতীত অপর কেহই বুঝিলেন না।

গুরুদেব কহিলেন,—"কুণ্ডলে, বাঙ্গালীর গৃহে তোমার জন্ম বটে; কিন্তু মনে রাখিও, তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণ এক দিন

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দিল্লীশ্বরকেও সংগ্রামে পরাস্ত করিয়াছিলেন। যে দিন তুমি প্রকৃত সিংহাসনে উপবেশন করিবে, সেই দিনই তোমার সম্পূর্ণ পরিচয় প্রাপ্ত হইবে।"

শিষ্য সীতাপতি ব্যগ্রভাবে উঠিয়া কহিলেন,—"বেলা চারি দণ্ডের অধিক হইয়াছে। পার্ব্বতীর বিচারকাল সমাগত।"

গুরুদেব কহিলেন,—"পার্ব্বতীকে আনয়ন কর।" এই কথাটি গুরুদেব যেন একটু নূতন স্বরে কহিলেন। গুরুদেবের গম্ভীর কণ্ঠে এরূপ স্বর পূর্ব্বে আর কখনও কাহারও শ্রুতিগোচর হয় নাই।

গুরুদেবের আজ্ঞা পাইয়া একজন শিষ্য পার্ব্বতীকে লইয়া আসিল। পার্ব্বতী আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইলেন। পার্ব্বতীর মুখমণ্ডলে কোনরূপ ভয় বা বিষাদের চিহ্ন কিছুমাত্র নাই। দেখিলে বোধ হয়, যেন পার্ব্বতী মৃত্যুকেও উপেক্ষা করিয়া নিজের গাম্ভীর্য্যের অতল গর্ভে নিমগ্ন রহিয়াছেন। কুণ্ডলা পার্ব্বতীকে দেখিয়া অন্তরে ঈষৎ ভীত হইল।

গুরুদেব পার্ব্বতীর বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া কহিলেন,—"কুণ্ডলা, আর্য্যপন্থীর জন্ম তোমায় যে নিরুপিত দণ্ডবিধান প্রদান করিয়াছিলাম, তাহা সম্যক্ রূপে অধীত হইয়াছে ত?"

কুণ্ডলা কহিল,—"অধ্যয়ন একরূপ করিয়াছি; কিন্তু সে অধ্যয়ন যে কতদূর কার্য্যে পরিণত হইবে, সে দুরদর্শিতা নাই।"

গুরুদেব গম্ভীর ভাবে কহিলেন,—"কার্য্যের সময় উপস্থিত। হৃদয়কে প্রস্তুত কর। কুণ্ডলে, স্বীয় প্রাণ অপেক্ষা সুহৃদের প্রাণ মূল্যবান্ বলিয়া বুঝ কি?"

কুণ্ডলা। সেইরূপ উপদেশই এ পর্য্যন্ত পাইয়া আসিতেছি।

গুরুদেব। সুহৃদের প্রাণ অপেক্ষা ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা অধিক বলিয়া বিবেচনা কর কি ?

কুণ্ডলা। এইরূপ গুরুতর প্রশ্নের উত্তর কার্য্যের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া প্রদান করাই কর্ত্তব্য।

গুরুদেব। কার্য্য কাল উপস্থিত। দৃষ্টান্ত প্রদর্শন কর।

এই কথা বলিতে বলিতে গুরুদেবের স্বর ঈষৎ বিকৃত হইল। বিকৃত স্বরে কহিলেন,—"কুণ্ডলে, আর্য্যপত্নীর দণ্ডবিধানে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার কিরূপ দণ্ডের বিধান ব্যবস্থা হইয়াছে?"

কুণ্ডলা। সে বিধিস্থল পরিপূরণ করা হয় নাই। তাহা এ পর্য্যন্ত শূন্য রহিয়াছে।

গুরুদেব। অদ্য তুমি বিধানের কর্ত্রী। বিধানের সে শূন্য স্থল তোমাকেই পূরণ করিতে হইবে। তুমি প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গকারিণীর কিরূপ দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা করিতে চাও?

কুণ্ডলা। বর্ত্তমান যুগে উচ্ছৃঙ্খলময়ী আর্য্যনারীর জন্য তুষানল।

গুরুদেব সকল শিষ্যের সহিত সমস্বরে কহিলেন,—"সাধু কুণ্ডলে!"

পার্ব্বতী জলদগম্ভীর স্বরে কহিলেন,—"কুণ্ডলে, আমি আপন মুখেই স্বকৃত পাপ স্বীকার করিতেছি। সত্যই আমি প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অপরাধে অপরাধিনী। আমার দণ্ড বিধান উপযুক্ত হইয়াছে। এক্ষণে বলিয়া দাও, কোন্ দিনে আমাকে দণ্ডভোগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।" এই বলিয়া পার্ব্বতী স্বীয় অঞ্চলে মুখমণ্ডল আবৃত করিয়া নীরবে অধোবদন হইয়া রহিলেন।

কুণ্ডলা কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"অপরাধীর স্বকৃত অপরাধ স্বীকার ব্যতীত, এরূপ গুরুতর দণ্ড বিধানের ব্যবস্থায় অপর প্রমাণের আবশ্যক।"

গুরুদেব কহিলেন,—"কুণ্ডলে, আমি স্বয়ং অপরাধের প্রত্যক্ষ সাক্ষী।" পাষাণ বিগলিত হইল। গুরুদেব কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কুণ্ডলা বিকৃত কণ্ঠে কহিল,—"তবে অপরাধীর তুষানল ব্যবস্থাই স্থিরীকৃত হইল।"

পার্ব্বতী কহিলেন,—"রাজ্ঞি, দণ্ডবিধানের দিন অব-ধারিত করিয়া দাও।" কুণ্ডলার বাগ্‌রোধ হইয়াছে, কুণ্ডলা কথা কহিতে পারিল না। পাষাণপুত্তলিকার ন্যায় স্থির ভাবেই উপবিষ্ট রহিল।

গুরুদেব স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কুণ্ডলা, কবে পার্ব্বতীর প্রায়শ্চিত্ত দণ্ডবিধানের দিন স্থির করিলে?"

কুণ্ডলা কহিল,—"যে দিবস আনন্দ আশ্রমের প্রথম অধিবেশন হইবে।" এই বলিয়া কুণ্ডলা বেদী হইতে অবতরণ করিল। বিচার সমাধা হইল।

গুরুদেব বিমনা হইয়া ভাবিতে লাগিলেন,—"কুণ্ডলা এ কিরূপ আদেশ প্রদান করিল? আনন্দ আশ্রম কি পাপীয়সীর রক্তে কলুষিত হইয়া সংস্থাপিত হইবে?"

এমন সময়ে বলাইচন্দ্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গুরু-দেব বলাইকে একটু পার্শ্বে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলাই, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছ?"

বলাই কহিলেন,—"অনুসন্ধানে কৃতকার্য্য হইয়াছি মাত্র। কিছু সংবাদঅশুভ।

গুরুদেব। কিরূপ অশুভ? জীবন সম্বন্ধে নহে ত?

বলাই। না। জীবনের দুর্ঘটনা নহে; কারাগারে বন্দী হইয়াছে।

গুরুদেব। বন্দীই যে যথার্থ অনুসন্ধানের পাত্র, তাহা কিরূপে বুঝিলে?

বলাই। বন্দীর নাম, বংশ ও পূর্ব্ব আবাসের পরিচয় ও তাহাদের উদ্দেশ্য জানিয়াই বলিলাম।

গুরুদেব শিষ্য সীতানাথকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"সীতাপতি, তোমরা অর্দ্ধ শত জন বলাইএর সহিত অদ্যই দ্বিপ্রহরের মধ্যে রাজধানী গমন কর। তথায় চতুর্থ দিবসে সায়ংকালে ভাগীরথীর তীরে আমার সহিত তোমাদের সম্মিলন ও সাক্ষাৎ হওয়া প্রয়োজন। এক্ষণে কেবল মাত্র রামানন্দ আমার সঙ্গে আইস "

গুরুদেব পুনরায় বলাইএর প্রতি আদেশ করিয়া কহিলেন,—"বলাই, ইহাঁদের সহিত যাইয়া বন্দীর উদ্ধার সাধনের ষড়্‌যন্ত্র স্থির করিয়া রাখ। পরে আমার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিবে।"

বেদীমণ্ডপ হইতে সকলে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।
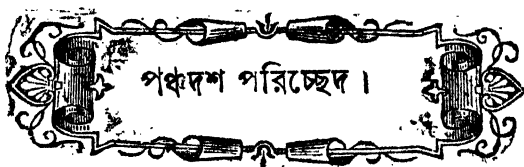
মনুষ্য দুঃখসমুদ্রে একেবারে ডুবিলেও জীবিত থাকিতে এত ইচ্ছুক কেন হয়? মৃত্যু কামনা কেন করে না? মানব যত কেন ঘোর বিপদে যতই দুঃখসাগরে পড়ুক না কেন, যতক্ষণ সে আশার আশ্রয়চ্যুত না হয়, ততক্ষণ তাহার সুখের আশা একেবারে বিনষ্ট হয় না; তাই মানবের বাঁচিতে এত সাধ। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই আশার কুহকে অভিজ্ঞ মানব মুগ্ধ হয় কেন? আশার ফল এ সংসারে কয় জন উপভোগ করিতে পারে? আর কয়টা লোকের ভাগ্যেই বা অবিমিশ্র সুখভোগের সুসংযোগ ঘটিয়া থাকে? নাই ঘটুক, মানব-জীবনে যে দুঃখের তাপ হইতে সুখের স্নিগ্ধতা অধিক, তাহা কি মানব—প্রেম ও জ্ঞানের অধিকারী মানব—অস্বীকার করিতে পারে? মানব যে দিন আপনার এই মহৎ প্রকৃতির কথা একেবারে বিস্মৃত হইবে, সেই দিনই তাহার আশা ভরসা ইহ জগতে ফুরাইয়া যাইবে, সেই দিন মানব নাম ধরণী হইতে বিচ্যুত হইবে, সেই দিনই এই পৃথিবী ব্যাঘ্র ভল্লুকের রাজত্বে পরিণত হইবে।

দণ্ডাজ্ঞা পাইয়া পার্ব্বতী গর্ব্বিত পদবিক্ষেপে স্বীয় কুটীরে আসিয়া উপবেশন করিলেন। ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া পার্ব্বতী কহিলেন,—"কলঙ্কভার মস্তকে বহন করিয়া দণ্ডাজ্ঞায় নিহত

হওয়া অপেক্ষা তৎপূর্ব্বেই আত্মহত্যা করাই কি আমার কর্ত্তব্য নয় ?” এই বলিয়া পার্ব্বতী নীরব হইলেন। পার্ব্বতী আবার বলিয়া উঠিলেন,—“কাহার আত্মা আমি হত্যা করিব ? এ আত্মা যে বলাইকে প্রদান করিয়াছি! বলাইচন্দ্র যে এ আত্মার অধিকারী। এখন যদি বলাই আসিয়া স্বহস্তে এই মুণ্ডচ্ছেদন করে, তবে বড় সুখে মরিতে পারি; কিন্তু তাহা ত হইবে না। দস্যুর হস্তেই এ প্রাণ হত হইবে।”

শেষ বাক্যাংশ পার্ব্বতী উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। পার্ব্বতীর নয়নাসার বর্ষার বৃষ্টিধারার ন্যায় অজস্র বর্ষিত হইয়া ধরাতল অভিষিক্ত করিল। পার্ব্বতী ক্ষণকাল অশ্রু বর্ষণের পরে কুটীরের চতুর্দ্দিক্ অন্বেষণ করিলেন। অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন, কোথাও অস্ত্র নাই। পার্ব্বতী কহিলেন,—“ছি ছি! আমার পাপ-জীবন কি নীচ! জন্মদাতা প্রতিপালক, ধর্ম্মপথের সহায়, পরমারাধ্য, দেবতুল্য পিতাও পাপচক্রে আজি দস্যু হইলেন!” পার্ব্বতী গগনভেদী চীৎকার করিয়া কহিল,—“কুণ্ডলে! তুষানল প্রজ্বলিত কর। আর বিলম্ব অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।”

চীৎকার শুনিয়া কয়েক জন শিষ্য আসিয়া কুটীর সম্মুখে দাড়াইল। পার্ব্বতী কহিলেন,—“প্রাণদণ্ডের দিন অদ্য স্থির হয় নাই। তোমরা প্রস্থান কর।”

একজন শিষ্য কহিল,—“আমরা ঘাতক নহি, প্রহরী; প্রহরার নিযুক্ত আছি। আবশ্যক হইলে, পুনরাহ্বানে আসিব।”

শিষ্যবর্গ প্রস্থান করিলেন। পার্ব্বতী অন্যমনস্ক হইলেন, পার্ব্বতী নিজ কেশরাশি আলুলায়িত করিলেন। সুদীর্ঘ কেশ পদতলে লুটাইতে লাগিল। পার্ব্বতী কহিলেন,—“যোগিনীর

কেশ! আজি তোমার সদ্ব্যবহার করিব। তোমাকেই অদ্য আত্মনাশের রজ্জুরূপে ব্যবহার করিব।"

পার্ব্বতী নিজ কেশভাগ পাকাইতে লাগিলেন। পাকাইতে পাকাইতে পার্ব্বতী প্রলাপবাক্যে কহিলেন,—"গুরুর আজ্ঞা ও প্রণয়ীর প্রেম এ উভয়ের মধ্যে বড় কে?"

পার্শ্ব হইতে উত্তর হইল,—"গুরুর আজ্ঞাই বলবৎ।" পার্ব্বতী চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন, বলাইচন্দ্র সম্মুখে!

পার্ব্বতী কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—"বলাইচন্দ্র, আবার কেন? বিশ্বাসঘাতিনীর নিকট আবার কেন আসিয়াছ? আর আমার সম্মুখে আসিও না। আমি দত্তাপহারিণী—আমাকে তুমি চিন নাই।"

বলাই কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন,—"পার্ব্বতি, আমি এখনই প্রস্থান করিব। আর ইহজন্মে তোমার সম্মুখে আসিব না; কিন্তু যাইবার অগ্রে তোমার নিকট হইতে একটি কথা শিখিয়া যাইতে ইচ্ছা করি।"

পার্ব্বতী আবার প্রলাপ বাক্যে কহিলেন,—"বলাই, তোমার নিকট কোন রূপ অস্ত্র পাইতে পারি কি?"

বলাই কহিলেন,—"অস্ত্র কি হইবে পার্ব্বতি? আত্মহত্যা করিবে না কি?"

"না। আত্মহত্যায় আত্মহীনের অধিকার ত নাই।" এই বলিয়া পার্ব্বতী বলাইএর হস্তদ্বয় ধারণ করিল। কহিল,—"বলাই, আমার একটি অনুরোধ রক্ষা করিবে কি?"

বলাই। তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে প্রাণ দিবার ক্ষমতা আছে, তাহাই দিব।

পার্ব্বতী। বলাই, প্রাণ দিতে হইবে না। প্রাণ লইতে পারিবে কি?

বলাই। কাহার প্রাণ লইতে হইবে? তাহা না জানিলে কিরূপে নিব?

পার্ব্বতী। যাহা তোমার হস্তগত—অধিকার ভুক্ত

বলাই হাসিয়া কহিলেন,—"এরূপ প্রাণ যদি আমার অধিকারে থাকে, তবে ত তাহা অগ্রেই গ্রহণ করিয়াছি। পুনরায় নূতন করিয়া তাহার কি লইব?"

পার্ব্বতী। সেরূপ আদান প্রদানের চাতুরী বাক্য বলিতেছি না। যে প্রাণে তোমার অধিকার আছে, তাহা সমূলে উৎপাটন করিয়া গ্রহণ করিবে?

বলাই দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া কহিল,—"পার্ব্বতি, তুমি প্রলাপ বকিতেছ কেন? তুমি কি প্রাণদণ্ডের ভয়ে এতই ভীত হইতেছ?"

পার্ব্বতী তেজঃপূর্ণ বাক্যে কহিলেন,—"বলাই, সত্য সত্যই বলিয়াছ। সত্যই আমি প্রাণের জন্য ভীত হইয়াছি। আমার প্রাণ যদি আমার অধিকারে থাকিত, তবে তুচ্ছ প্রাণকে ভ্রূক্ষেপও করিতাম না; কিন্তু বলাই, আমার প্রাণ যে আর আমার অধিকারে নাই, এ প্রাণ যে আমি অপরকে প্রদান করিয়াছি। ইহা ত এক্ষণে আমার নিকট গচ্ছিত রহিয়াছে মাত্র।" এই পর্য্যন্ত বলিয়া পার্ব্বতী নীরব হইলেন। পার্ব্বতী নিস্পন্দ জড়বৎ হইয়া রহিলেন।

বহির্ভাগ হইতে কে আহ্বান করিল,—"বলাই, রাজধানী যাত্রার কাল উত্তীর্ণ হইতেছে।"

আহ্বানে বলাই উন্মত্তের ন্যায় হইয়া উঠিল। বলাই হৃদয়-ভেদী স্বরে কহিল,—"পার্ব্বতি! তব আজ্ঞা শিরোধার্য্য—সেই আদেশে বিদায় হইলাম।" ক্ষিপ্তের ন্যায় বলাই পার্ব্বতীর বদ্ধমুষ্টি হইতে স্বীয় হস্ত ছাড়াইয়া দৌড়াইয়া বাহির হইল। পার্ব্বতী বৃক্ষচ্যুতা লতিকার ন্যায় ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।
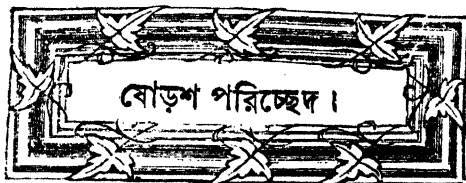
গুরুদেব জ্ঞানানন্দ নামক শিষ্যের সহিত সুবর্ণরেখার তীরস্থ অরণ্যাবৃত সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া চলিতেছেন। উভয়ে অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া চলিয়াছেন। বেলা প্রায় তৃতীয় প্রহর পর্য্যন্ত উভয়ে এই ভাবে আন্দাজ অর্দ্ধ ক্রোশ চলিয়া আসিয়া গুরুদেব কহিলেন,—"জ্ঞানানন্দ, উপবেশন কর।" সুবর্ণরেখা তীরস্থ এক বৃক্ষতলে গুরুশিষ্য উপবেশন করিলেন।

সুবর্ণরেখা এই স্থানে দুই শাখায় বিভক্ত হইয়া ধীর প্রবাহে সাগরাভিমুখে মৃদুগতিতে গমন করিতেছে।

গুরুদেব এই উভয় শাখার মধ্যস্থ এক অত্যুন্নত স্থলের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন,—"জ্ঞানানন্দ, ঐ অত্যুন্নত ভূ-খণ্ডের উপরিভাগে আর্য্যপল্লী সংস্থাপিত হইয়াছে, আনন্দ-আশ্রম উহার অপর এক বাহ্যিক নাম মাত্র। তথায় যাইয়া উহার আভ্যন্তরিক ব্যবস্থা বিধান অবগত হইবে; কিন্তু তৎ-পূর্ব্বে তোমাকে কিছু জিজ্ঞাস্য কথা আছে।" এই কথা অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে কহিয়া গুরুদেব আবার গম্ভীর স্বরে

কহিলেন,—"বল দেখি, জ্ঞানানন্দ আর্য্যপল্লীর চরম উদ্দেশ্য কি ?"

জ্ঞানানন্দ কহিলেন,—"আর্য্যধর্ম্মের অভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণই আর্য্যপল্লীর চরম উদ্দেশ্য। আমার ক্ষুদ্র অনুমান এই সিদ্ধান্তের উর্দ্ধে উঠিতে অসমর্থ।"

গুরুদেব। জ্ঞানানন্দ, তুমি অনুমান যথার্থই করিয়াছ। আর্য্যধর্ম্মের সংরক্ষণ ব্যতীত আর্য্যপল্লীর উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে; তবে ইহাও জানিও, আর্য্যধর্ম্মের অভ্যুদয়ের সহিত হিন্দু জাতির পুনরভ্যুদয় অবশ্যম্ভাবী; তদ্ব্যতীত আর্য্য বংশধরের অধঃপতন সুনিশ্চয় জানিবে।

জ্ঞানানন্দ বিস্মিত ভাবে কহিলেন,—"ঠাকুর, একটি কথা জানিতে বড়ই কৌতূহল জন্মিয়াছে। আর্য্যধর্ম্ম সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তব্যাপী অতি বিস্তৃত সামগ্রী; কিন্তু বর্ত্তমান আর্য্যপল্লী ত বাস্তবিকই এখন ক্ষুদ্র পল্লী মাত্র। এই ক্ষুদ্র পল্লীতে কি আর্য্যধর্ম্মের সর্ব্ব অঙ্গ সম্যক্ রূপে সুরক্ষিত থাকিবে ?

গুরুদেব হাসিয়া কহিলেন,—"জ্ঞানানন্দ আর্য্যপল্লী আর্য্যধর্ম্মের শিরস্ত্রাণ; মস্তক বর্ম্মস্বরূপ, আর্য্যধর্ম্মের মস্তিষ্কে আঘাত লাগিবার উপক্রম এতদিনে হইয়াছে। এই মস্তিষ্ক রক্ষিত হইলে, আর্য্যধর্ম্মের অপর ক্ষুদ্র অঙ্গ নাশে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। আর্য্যপল্লী আর্য্যধর্ম্মের মস্তিষ্ক রক্ষা করিবে।"

জ্ঞানানন্দ। আর্য্যধর্ম্মের মস্তিষ্ক কি ?

গুরুদেব। এতদিনে তবে কি বুঝিয়াছ ? ব্রহ্মচর্য্যই আর্য্যধর্ম্মের মস্তিষ্ক। জ্ঞানানন্দ জানিও, যদি এই ব্রহ্মচর্য্যের কোন দিন পুষ্টিলাভ হয়, তবেই জগতে হিন্দুজাতির পুনরভ্যুদয় হইবে।

পক্ষান্তরে এই ব্রহ্মচর্য্যের অধঃপতনে হিন্দুর বিলোপ অনিবার্য্য এবং অবশ্যম্ভাবী। প্রকৃত ব্রহ্মচর্য্য সংসারে—বিশেষতঃ ম্লেচ্ছ-সংশ্লিষ্ট রাজ্যাভ্যন্তরে অসম্ভব। সেই নিমিত্ত যে সকল মহা-পুরুষ ম্লেচ্ছ সংশ্রব ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিতে উৎসুক, এই আর্য্যপল্লী তাঁহাদেরই সম্মিলন ক্ষেত্র। ইহাঁরাই হিন্দু সমাজের প্রকৃত আচার্য্য।

জ্ঞানানন্দ নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিয়া সাতিশয় আগ্রহ ও ঔৎসুক্যব্যঞ্জক স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ঠাকুর, ব্রহ্মচর্য্য সম্যক্‌রূপে সাধনের নিমিত্ত কোন্ কোন্ উপাদানের প্রয়োজন?" গুরুদেব বলিলেন,—"বৎস, আর্য্যধর্ম্ম সাধন অতি কঠোর কার্য্য। ইহা সাধনের নিমিত্ত এক পক্ষে সিংহের তেজ এবং বিক্রম, পক্ষান্তরে মেষশাবকের মৃদুতা আবশ্যক। বড় ভাগ্য-বান্ পুরুষের ভাগ্যে এ সাধনা সংঘটন হয়।"

"জ্ঞানানন্দ, ব্রহ্মচর্য্যের প্রধান উপাদান নিষ্ঠা ও সংযম; আর গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস, ইহার মূলভিত্তি জানিও। যেখানে গুরুবাক্যে অটল বিশ্বাস, সেই স্থানে নিষ্ঠা; আর সংযম নিষ্ঠার নিত্য সহচর জানিবে; গুরুমন্ত্রে দীক্ষালাভে নিষ্ঠার উদ্ভব। নিষ্ঠা, সংযমের সহিত সম্মিলিত হইয়া পুরুষের চিত্তশুদ্ধি ও আত্মার সংস্কার উদ্ভব করে। সাধনের মূলপন্থা এই চিত্ত শুদ্ধি।

"জ্ঞানানন্দ, সকল বৃত্তির পূর্ণ অনুশীলন করিতে, যে ধর্ম্ম উপদেশ প্রদান করে, সে ধর্ম্ম অনার্য্য ধর্ম্ম। বৃত্তির সামঞ্জস্য সাধন আর্য্য চক্ষে অতি হেয় কার্য্য। সকল বৃত্তির সামঞ্জস্য বা অনু-শীলন সংসারের পথে বিষম কণ্টক স্বরূপ। সে অনার্য্য শিক্ষায় ভ্রান্ত হইও না।"

"বৎস, একটি পন্থা ছাড়িয়া বহু পন্থা অবলম্বন করিলে নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে যাইতে পারা যায় না। মানব হৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির ভিন্ন ভিন্ন পন্থা। যে, যে বৃত্তিকে অবলম্বন করে, সে সেই পন্থায় নির্দ্দিষ্ট স্থলেই উপনীত হয়। আর, যে বহু বৃত্তির অনুসরণ করিয়া বহু পন্থা ধরিতে যায়, সে চিরদিন সংসার-চক্রে ঘুরিয়াই বৃথা জীবন বৃথাই অতিবাহন করে।

পাপতাপময় কলিযুগে মানবের জীবন অতি স্বল্পাবশিষ্ট, দেহ ক্ষীণ, হৃদয় দুর্ব্বল। তন্মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের দশা সর্ব্বাপেক্ষা শোচনীয়, এ অবস্থায় আর্য্যসন্তানের কর্ত্তব্য কি? একই পন্থা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসাধনের চেষ্টা করাই এক্ষণে আর্য্যসন্তানের পক্ষে শ্রেয়ঃ। জ্ঞানানন্দ, বৃত্তির অনুশীলন, বা বৃত্তির সামঞ্জস্য প্রভৃতি অনার্য্য পথে চালিত হইও না। সংযম, আত্মনিবেশ করিতে শিক্ষা কর, ফললাভ হইবে।"

এই বলিয়া গুরুদেব কটিদেশ হইতে একখণ্ড কাগজ বাহির করিয়া কহিলেন,—"জ্ঞানানন্দ, মন্ত্র গ্রহণ কর। শিষ্যগণের মধ্যে তুমি সমধিক বীর্য্যবান্, এজন্য তোমাকেই সর্ব্বাগ্রে মন্ত্রদীক্ষা দিলাম।"

জ্ঞানানন্দ অবনত মস্তকে গুরুদেবের হস্ত হইতে কাগজ খণ্ড গ্রহণ করিয়া ভূমিতলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন।

গুরুদেব হস্তদ্বয় উত্তোলন করিয়া মনে মনে আশীর্ব্বাদ করিলেন; কহিলেন,—"জ্ঞানানন্দ, তোমাকেই অতি সত্বর আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া অপর শিষ্যগণকে এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইবে" শুনিয়া জ্ঞানানন্দ মস্তক অবনত করিলেন।

তৎপরে উভয়ে উঠিয়া চলিতে আরম্ভ করিলেন। উভয়ে নদীতটে উপনীত হইয়া তীরস্থিত ভেলায় উঠিয়া সুবর্ণরেখা পার হইলেন। আর্য্যপল্লীতে উপনীত হইয়া জ্ঞানানন্দ গুরুদেবের সহিত সমগ্র আর্য্যপল্লী পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে, জ্ঞানানন্দ মুগ্ধ ও বিস্মিত হইলেন।

জ্ঞানানন্দ দেখিলেন,—চতুর্দ্দিকে একক্রোশ পরিমিত উচ্চ ভূমিখণ্ড, বৃত্তাকারে অশোক, পারিজাত ও পলাশ বৃক্ষের চক্রে পরিবেষ্টিত। সেই বৃক্ষবৃত্তের চতুর্দ্দিকে চারিটি সুবৃহৎ দ্বার। দুইটি করিয়া নারিকেল বৃক্ষ প্রত্যেক দ্বারের স্তম্ভাকারে দণ্ডায়মান।

প্রথম চক্রের অভ্যন্তরে দশহস্ত ব্যবধানে নারিকেল বৃক্ষ সমন্বিত দ্বিতীয় বৃত্ত। প্রত্যেকটি পঞ্চ হস্ত পরিমিত দূরে দূরে রোপিত। নারিকেল বৃক্ষ সমূহের গাত্রে ছয় হস্ত উর্দ্ধ পর্য্যন্ত জাফরির বেড়া; বেড়ার গাত্রে বনলতার মণ্ডপ। এই বিস্তীর্ণ লতামণ্ডপ বারমাস ফলপুষ্পে সুশোভিত এবং নানাবিধ বন-বিহঙ্গমের কেলিকাননে পরিণত।

দ্বিতীয় বৃত্তের চারি হস্ত ব্যবধানে গুবাকবৃক্ষ রোপিত তৃতীয় বৃত্ত এবং তৃতীয় বৃত্তের গাত্রে মালতী, মাধবী প্রভৃতি বিবিধ জাতীয় লতামণ্ডপ পরিশোভিত। তৃতীয় বৃত্তের অভ্যন্তরস্থ ভূমিখণ্ড সমূহ বিবিধ পুষ্পবৃক্ষের বিচিত্র উদ্যান।

তৃতীয় বৃত্তের অভ্যন্তরে ছয় হস্ত পরিমিত প্রশস্ত পথ। পথের উভয় পার্শ্বে বকুল বৃক্ষের সারি। প্রত্যেক বকুল বৃক্ষের তলে এক একখানি সমাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ। প্রত্যেক গৃহ দৈর্ঘ্যে বারহস্ত এবং দাওয়া সমেত প্রশস্তে দশ হস্তের অধিক

নহে। গৃহের সম্মুখে গৃহ পরিমিত অঙ্গন। অঙ্গনের চারিপার্শ্বে তুলসী বৃক্ষে পরিবেষ্টিত; কেবল সম্মুখভাগে দুইহস্ত পরিমিত অনাবৃত একটি করিয়া বহির্দ্বার। তুলসী কুঞ্জের গায়ে গায়ে সংশ্লিষ্ট নানাবিধ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুষ্পবৃক্ষ।

এই সকল গৃহশ্রেণীর পরেই বৃত্তাকারে দ্বিতীয় পথ। পথের অভ্যন্তরে পূর্ব্ববৎ ক্ষুদ্র গৃহের সারি এবং ইহাদেরও বাহ্যিক ব্যবস্থা প্রায় প্রথম শ্রেণীর সদৃশ। বিভিন্নের মধ্যে এই দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ গৃহরাজি বকুল বৃক্ষের পরিবর্ত্তে বিল্ববৃক্ষমূলে সংস্থিত।

দ্বিতীয় গৃহশ্রেণীর পরেই পঞ্চদশ হস্ত পরিমিত বিস্তৃত উচ্চ বৃত্তপথ। বৃহৎ অজগরের ন্যায় এই বৃত্তপথ এক সুবিস্তীর্ণ সুন্দর শ্যামলক্ষেত্র বেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করিতেছে। বৃত্তপথের ক্ষেত্রপার্শ্বে বহু দূরে দূরে অবস্থিত চম্পকবৃক্ষ। চম্পক বৃক্ষ-তলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনোহর নিকুঞ্জ। ক্ষেত্রের মধ্যস্থলে এক নাতি-দীর্ঘ নাতিক্ষুদ্র বনস্পতি। বনস্পতিতলে শিবমন্দির। মন্দিরের সম্মুখে বিংশতি হস্ত ব্যবধানে পাঁচ ছয় হস্ত পরিমিত উচ্চ এক প্রস্তর নির্ম্মিত বেদী। এই বেদীর চতুঃপার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু-সংখ্যক বেদীমণ্ডলী বৃত্তাকারশ্রেণীনিবদ্ধ।

সন্ধ্যার প্রাক্কালে জ্ঞানানন্দ দেখিলেন, প্রথম শ্রেষ্ঠ বেদিকায় এক বিরাটমূর্ত্তি মহাপুরুষ সমাধিমগ্ন। চারিপার্শ্বস্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেদিকায় গুরুদেবের ন্যায় শত শত মহাত্মা ধ্যানমগ্ন।

গুরুদেব মহাপুরুষের বিরাট মূর্ত্তির প্রথম সন্দর্শনে সাষ্টাঙ্গে ভূতলে প্রণত হইলেন। জ্ঞানানন্দ মহাগুরুকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। গুরুদেব জ্ঞানানন্দকে সঙ্গে লইয়া এক চম্পকতলে আসিয়া অলক্ষিত ভাবে দাঁড়াইলেন। কহিলেন,—"জ্ঞানানন্দ,

মহাপুরুষের মহান্ মুর্ত্তি নিরীক্ষণ করিয়া আত্মাকে বাধিত কর। যিনি, বর্ষকাল অবধি ঐ স্থানে ঠিক্ ঐ ভাবেই সমাধিস্থ রহিয়াছেন। এখন দেখ, আর্য্য কি বলে বলী হইবার প্রার্থী। জ্ঞানানন্দ, ইহারই নাম প্রকৃতি বিজয়। সামান্য অগ্নি, বাষ্প বায়ুকে আয়ত্তাধীন করিলে প্রকৃতি বিজয় হয় না। তদ্দ্বারা মানব বিজয়ী না হইয়া অধিক পরিমাণে দেহ ও বৃত্তিরই বশীভূত হয় মাত্র। দেহকোষ বা বৃত্তিকোষ মানবের আত্মীয় নহে। উহাদিগকে আর্য্যগণ বাহ্য প্রকৃতির মধ্যেই গণনা করিয়া থাকেন। ভাবিয়া দেখ জ্ঞানানন্দ, এরূপ জ্ঞান ও গণনা কিরূপ অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতার কার্য্য। এই ক্ষমতার মূল ভিত্তি বৃত্তি ও সংযম; বৃত্তির অনুশীলন নহে; যেই হেতুই আমি তোমাদিগকে বারম্বার বাক্য মন ও দেহের সংযম শিখিতে উপদেশ প্রদান করিয়াছি। অনার্য্য শিক্ষায়, অনার্য্য আচারে, সংযমের পরিবর্ত্তে পাশব বৃত্তির অনুশীলনে উত্তেজিত করে। তাহাতে মানব মনুষ্যত্ব ভ্রষ্ট হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হয়।”

গুরুদেবের বাক্য সমাপ্তি হইতে না হইতে সূর্য্যদেব অস্তমিত হইলেন। বেদীর উপরিস্থ মহাপুরুষ সমাধি ভঙ্গ করিয়া চক্ষু রুন্মিলন করিলেন। চতুষ্পার্শ্বে শিষ্যমণ্ডলী সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইল।

গুরুদেব জ্ঞানানন্দকে লইয়া মহাপুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। মহাগুরু, গুরুদেবকে সম্বোধন করিয়া ধীরে ধীরে কহিতে লাগিলেন,—“ভাস্কর স্বামীর এই আর্য্যপল্লীর শিষ্যবর্গ, আশ্রম উপযোগী হইয়াছেন। ইহাদিগকে লইয়া আর্য্যপল্লীর আশ্রম সংস্থাপন কর। আগামী বিষুব সংক্রান্তিতে আর্য্যপল্লীর

প্রথম অধিবেশন দিবস স্থির হইয়াছে। সেই দিবস কুণ্ডলার অভিষেক করিও। কুণ্ডলা শাসনদণ্ড পরিচালনের যে যথার্থ উপযোগী হইয়াছে, তাহা আমি অবগত আছি। আমি এক্ষণে ত্রৈলঙ্গ প্রদেশে যাত্রা করিলাম। এখানে আর আমার কাল ব্যয় অনাবশ্যক। তথাকার আর্য্যপল্লী সংস্থাপনে দিবস অতি নিকট। পুর্ব্ব দেশীয় এই আর্য্যপল্লীর ভার তোমারই স্কন্ধে নিহিত রহিল। তুমি সকলের পরিচালক হইয়া আর্য্যবিধান সংস্থাপনে রত হও।"